প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৭ ❖ ২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল

ভস্ম : শুদ্ধি হওয়ার তিলক

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভাষাশহীদগণ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

বই এবং বইমেলা

প্রয়াত রোজমেরী গোমেজ

জন্ম : ২২ আগস্ট ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
তেজগাঁও ধর্মপল্লী

পৃথিবীর রূপরস, আত্মীয় পরিজনের সান্নিধ্যে সকলের একান্ত প্রীতি বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে পরম মমতাময়ী, স্বামী, সন্তান, আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধবীদের সবটুকু সুখে রাখার জন্য যিনি ছিলেন নিত্য তৎপর, সেই রোজমেরী গোমেজ বিগত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পরপারে যাত্রা করেন।

তিনি ছিলেন সাদা মনের মানুষ। তিনি ছিলেন স্বল্প-কথার মানুষ, দরদী-মন, প্রার্থনাশীল একজন মানুষ, কষ্ট-সহিষ্ণু, অতিথি পরায়ণ, গরিবের-বন্ধু, প্রেমভরা-মনের একজন মানুষ। সবার সাথে যোগাযোগ, খবরাখবর নিতেন, বিপদের সময় ছুটে যেতেন প্রয়োজনে পরামর্শ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিনী। স্বামীর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততা, অনুরাগ, প্রেম ভরা মন নিয়ে নিরলসভাবে নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। সন্তানদের পরম মমতায় আর ভালবাসা দিয়ে তিনি শক্ত করে আগলে রেখেছিলেন। খ্রিস্টিয় আদর্শে নিজে যেমন ছিলেন, তেমনি একজন ধর্মনিষ্ঠা নারীর মতোই পালন করেছেন।

ধন্যা কুমারী মারিয়ার প্রতি গভীর ভালবাসা এবং যিশু হৃদয়ের প্রতি গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। নিজেরে সন্তানদের গড়ে তুলেছিলেন তিলে তিলে সত্যনিষ্ঠ হতে এবং আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে। জীবনে সকল কষ্ট জয় করেছেন সকলকে সুখে রাখতে। সকল আত্মীয় পরিজনকে আপন করে নিয়েছেন স্বীয় উদারতা ও ভালবাসায়। তিনি, যিনি নিজের কষ্ট কখনও প্রকাশ করেননি যতক্ষন কষ্ট বহন করার শক্তি ছিল। আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন, রেখে গেলেন ধরাধামে স্বামী, এক মেয়ে, দুই ছেলে, মেয়ে জামাই, দুই ছেলে বউ, এক নাতী ও তিন নাতনী; আর, তিনি যে সংসারে এসেছিলেন, সেই সংসারের বহু আত্মীয়-স্বজন ও নাতী-নাতনী। সবার আদরের, কারও দিদি, কারও দিদিমা ছিলেন।

তার অসুস্থতায় বিশেষ করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যারা সহযোগিতা ও প্রার্থনায় স্মরণ করেছেন তাদের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আগত খ্রিস্টভক্তদের ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই মঙ্গলবাদ।

তিনি সকলের আপনজন ছিলেন। আমরা আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই। রোজমেরীর গোমেজের আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ করছি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্বামী : ফিডেলিচ গোমেজ
বড় ছেলে- ছেলে বউ : থিয়টনিয়াস লেকাভালিয়ার গোমেজ
মেরী গ্লোরিয়া রোজারিও
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : মেরী ফ্লোরেন্স গোমেজ (মুক্তা)
খ্রিস্টফার রোনাল্ড গোমেজ (রকি)
ছোট ছেলে- ছেলে বউ : জন ম্যাক্সওয়েল গোমেজ
এডবিনা আলেকজান্দ্রিয়া পেনিওটি
নাতী-নাতনী : রুফাস এঞ্জেলো গোমেজ
এ্যামা জোএ্যান গোমেজ
অরোরা জেরালডিন গোমেজ
এ্যালা জেনিন গোমেজ

বিজ্ঞ/৪৯/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৭
২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১১ - ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রয়োজন ভাষার শুদ্ধতা, প্রয়োজন জীবনের শুদ্ধতা

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষার মধ্যে বাংলাও অন্যতম। বাংলা ভাষার যেমন রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তেমনি শোনার মাধুর্য। আর এই মাধুর্যময় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে করুণ কাহিনীও রয়েছে, যা সংগঠিত হয়েছিল পাকিস্তানী শাসনামলে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তাই শোক আর গৌরবের সমন্বয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এক ঐতিহাসিক মাস ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা আজ থেকে ৬৮ বছর আগে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন ঢাকার রাজপথ। জীবন দিয়েছিল কিন্তু ভাষা দেয়নি। মাতৃভাষার রক্ষার জন্য নিজ জীবনদানের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিল বাংলার দামাল সন্তানেরা। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। পাকিস্তানীদের কাছে একসময় যা ছিল উপেক্ষার, সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ববাসীর কাছে তা-ই হয়ে ওঠলো সম্মানের ও গৌরবের।

২১ ফেব্রুয়ারিতে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান দেখাই। ভাষা শহীদেরা যে মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের নিখাঁদ ভালবাসা ও অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। কেননা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে কোনো জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, পারে না নিজের পরিচয়কে পৃথিবীতে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করতে। ২১ ফেব্রুয়ারির ইতিহাস বাংলা ভাষাভাষীদের আহ্বান করছে নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। বর্তমান বাস্তবতায় আমরা অনেকেই একসময়কার পাকিস্তানীদের মতো বাংলাকে উপেক্ষা করছি। উন্নাসিকতা প্রকাশ করি শুদ্ধভাবে বাংলা শিখতে ও চর্চা করতে। আমাদের নাটক, গল্পে, সিনেমায় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলার যে ধরণ তা ভাষার জন্য ক্ষতিকর। আঞ্চলিকতার নামে আমরা যেন ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট না করি। বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণ নীতি ব্যবহার খুবই জরুরী। সেইসাথে বাংলা ভাষাকে কোন রূপ বিকৃতি কিংবা অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা এখনই শুরু করা দরকার। কেননা একটি জাতির সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যমই হলো মাতৃভাষা। আমাদের ভাষার সম্মান ও বিশুদ্ধতা আমাদেরই রাখতে হবে।

শুদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিশেষ অবদান রেখে আসছে বাঙালির জীবনে। দীর্ঘকাল ধরেই আমাদের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে মূলত এই মেলাকে কেন্দ্র করে। বই পাঠে উৎসাহিত করতে এই মেলার বিকল্প নেই। বইমেলাতে অনেক লেখক ও মানুষের সমাগম হলেও খ্রিস্টানগণ অনেকটা পিছিয়ে। শুধু বই প্রকাশে নয় পড়াতেও ভীষণ অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু বই আমাদেরকে জ্ঞানদানের সাথে সাথে বিশুদ্ধ আনন্দও দান করে। মুক্তিযুদ্ধ ও জাতি গঠনে খ্রিস্টানেরা যেভাবে অংশ নিয়েছিল; প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আশা করি সঠিক ভাষা চর্চা ও সাহিত্য জগতেও তদ্রুপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ থেকে খ্রিস্টানগণ কপালে ছাই মেখে শুরু করবে তপস্যাকাল। ভস্ম বুধবারে ছাই লেপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষয়িষ্ণুতার কথা স্মরণ করবে এবং একই সাথে নিজেদেরকে পরিবর্তন করার সাধনায় ব্রতী হবে। নিজ জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে শুদ্ধ ও খাঁটি জীবন গড়তে ব্রতী হোক প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"আর তোমরা যদি কেবল নিজ-নিজ ভাইদের সঙ্গে কুশল বিনিময় কর, তবে অসাধারণ কীবা কর? বিজাতীয়রাও কি সেইমত করে না? অতএব এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।" - মথি ৫:৪৭-৪৮

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

“আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে” (যোহন ১১:২৫)

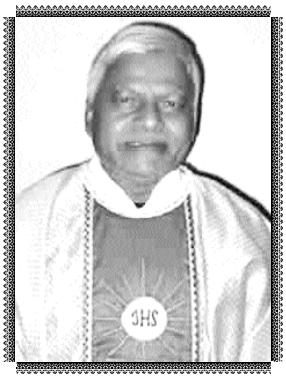

পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে অশ্রুজলে সিঞ্চন করে প্রথম বাংলাদেশি অবলেট ধর্মযাজক স্বর্গীয় ফাদার হেনরী রিবেরু ওএমআই ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ২:০০টায় ইব্রাহীম কার্ডিয়াক মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ফাদারের চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিত। রাতে খাবারের পর রাত ৮:৩০ মিনিটের পর থেকেই ফাদার অস্বাভাবিক অনুভব করতে থাকেন। তখন অবলেট ফাদার, তাঁর বড় বোন সিস্টার নিবেদিতা এসএমআরএ এবং সেমিনারীয়ানদের সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে আলরাজী হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানে ডাক্তারগণ উন্নত চিকিৎসার জন্য ইব্রাহীম কার্ডিয়াক মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তিন ঘন্টা লাইফ সাপোর্টে থাকার পর রাত ২:০০ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রয়াত ফাদার রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা ও আদর্শ। ফাদারের কার্যক্ষেত্র ছিল বিশাল, প্রয়াত ফাদার হেনরী রিবেরু খ্রিস্টের বাণী খাসিয়া, মান্দি, চা-বাগানি, উরাও, সান্তাল, পাহাড়িয়া, দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রচার করে গেছেন। যাজক হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে দীর্ঘ ৩৮ বছর প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবা দিয়েছেন। ফাদার মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য যেখানে গিয়েছেন সেখানকার মানুষকে আপন করে নিয়েছেন, হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছেন, তাঁর হাস্যোজ্জ্বল অবয়ব দিয়ে অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। ফাদারের অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, শাসন, মায়া-মমতা এত মধুময় স্মৃতিগুলো আজও আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। আজও তাঁর সুকণ্ঠ, সুকোমল নিবিড় প্রেমের স্পর্শ অনুভব করি প্রতিটি নিঃশ্বাসে। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তিন স্থানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় প্রথমত অবলেট সেমিনারী আসাদগেট খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই বাংলাদেশ অবলেট ডেলিগেশন সুপিরিওর। একই দিনে তুমিলিয়া মিশনে শ্রদ্ধেয় ফাদার সুব্রত টলেন্টিনু দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। একই দিন বিকেলে তাঁর মরদেহ কুলাউড়া মিশন মৌলভীবাজার নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ বিজয় ডি ক্রুশ ওএমআই। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সংঘের ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ ফাদারের আত্মীয়স্বজন, বহু খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য ধর্মালম্বী ভাইবোনেরাও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রয়াত ফাদারকে অবলেট ফাদারদের নিজস্ব কবরস্থানে সমাধিস্থ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই। স্বর্গরাজ্যে অনন্ত বিশ্রামে সুখে থাকো। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর প্রয়াত ফাদার হেনরী রিবেরুর আত্মা অনন্তধামে চিরশান্তিতে রাখুন।

নাম : **প্রয়াত ফাদার হেনরী রিবেরু, ওএমআই**
জন্ম ও জন্মস্থান : ১৫ জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ, চড়াখোলা, তুমিলিয়া মিশন
মৃত্যু ও সমাধিস্থান : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, কুলাউড়া মিশন, মৌলভীবাজার, সিলেট
পিতা : প্রয়াত মিনু রিবেরু
মাতা : প্রয়াত রজা কোড়াইয়া
ভাইবোন ও অবস্থান : ৪ ভাই ও ৩ বোন, সর্বকনিষ্ঠ

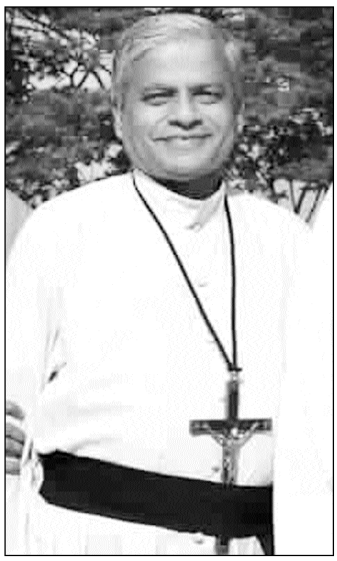

শিক্ষা জীবন

প্রাইমারী : তুমিলিয়া ও বান্দুরা স্কুল
মাধ্যমিক : বান্দুরা হলিক্রস স্কুল, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
সেমিনারীতে প্রবেশ : ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
উচ্চ মাধ্যমিক : নটরডেম কলেজ, ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দ
স্নাতক : নটরডেম কলেজ, ১৯৭৩-৭৫ খ্রিস্টাব্দ
নভিশিয়েটে গমন : ৩০ মে, ১৯৭৬, মাদ্রাজ, ভারত
প্রথম ব্রত : ৩১ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
শেষ ব্রত : ২৮ জুলাই, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
ঐশতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র : বনানী মেজর সেমিনারী
ডিকন অভিষেক : ১৫ আগষ্ট, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক : ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

পালকীয় দায়িত্ব

১। অবলেট সেমিনারী : সহকারী পরিচালক, আহ্বান পরিচালক, আধ্যাত্মিক পরিচালক; ঢাকা আর্চডাইসিস।
২। পাল-পুরোহিত : সাধু টমাসের গির্জা, মুগাইপাড় মিশন, সিলেট ধর্মপ্রদেশ।
৩। পাল-পুরোহিত ও সহকারী : সাধু ইউজিনের গির্জা, খাদিম নগর, সিলেট ধর্মপ্রদেশ।
৪। পাল-পুরোহিত : লক্ষীপুর মিশন, সিলেট ধর্মপ্রদেশ।
৫। পাল-পুরোহিত : জামালখান মিশন, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ।
৬। পাল-পুরোহিত : সাধু পলের গির্জা, কাটাডাঙ্গা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

- শোকার্ত অবলেট পরিবার

বিপ/৫৬/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

লেবী ১৯: ১-২, ১৭-১৮, সাম ১০৩: ১-৪, ৮ ও ১০, ১২-১৩, ১ করি ৩: ১৬-২৩, মথি ৫: ৩৮-৪৮

২৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

যাকোব ৩: ১৩-১৮, সাম ১৯: ৭-৯, ১৪, মার্ক ৯: ১৪-২৯

২৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

যাকোব ৪: ১-১০,সাম ৫৫: ৬-১০, ২২, মার্ক ৯: ৩০-৩৭

২৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

উপবাস পালন ও মাংসাহার ত্যাগ

যোয়েল ২: ১২-১৮, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫, ২ করি ৫: ২০–৬:২, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

তপস্যাকালের ধন্যবাদিকা স্তুতি

২য় বিবরণ ৩০: ১৫-২০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ৯: ২২-২৫

২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী শুক্রবার (প্রাহরিক প্রার্থনা-৪)

তপস্যাকালের ধন্যবাদিকা স্তুতি

ইসাইয়া ৫৮: ১-৯, সাম ৫১: ১-৪, ১৬-১৭, মথি ৯: ১৪-১৫

২৯ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

তপস্যাকালের ধন্যবাদিকা স্তুতি

ইসাইয়া ৫৮: ৯খ-১৪, সাম ৮৬: ১-৬, লুক ৫: ২৭-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. সেন্ট ক্যান্ডিড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফাদার উইলিয়াম মারফি সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল এ. ডি' রোজারিও সিএসসি (খুলনা)

২৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

+ ১৯২৫ ফাদার এমিল লাফন্ড সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৩ ফাদার যোসেপ্পে লাজারনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লুইস লিডাক সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পোয়ারিয়ে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. উনিফ্রেড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী শান্তি এসএমআরএ

মাতৃভাষার চর্চা হোক শৈশব থেকেই

শৈশব থেকেই মাতৃভাষার চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা শিশুদের সাংস্কৃতিক জীবনের বৃক্ষ এবং এর শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠে শৈশবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেকোন মাতৃভাষাই নিজ সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তা চর্চা এবং অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। শৈশবে মাতৃভাষার সঠিক চর্চা এবং অনুশীলন অনেকাংশেই নির্ভর করে অভিভাবকের ওপর। যদি শৈশব থেকেই মাতৃভাষা চর্চার বিষয়টি জোর না দেয়া হয়, তবে সেই শিশুটি মাতৃভাষার গুরুত্ব কখনও উপলব্ধি করতে পারবে না। মাতৃভাষা চর্চা শিশুর নিজ সংস্কৃতির সাথে এক ব্যক্তিগত আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সময়ের পরিক্রমায় যেমনিভাবে শিশুটি বেড়ে উঠে, তেমনিভাবে সংস্কৃতিও বিকশিত হতে থাকে। মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে শুধুমাত্র সংস্কৃতির বিকাশই নয় বরং ব্যক্তিচিন্তার চর্চারও সুযোগ সৃষ্টি হয়। শৈশবে মাতৃভাষার চর্চা শিশুদের চিন্তা চর্চাকে আরো বেশি আন্দোলিত করে এবং উৎসাহিত করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে, দেশীয় পটভূমিতে আদিবাসিদের মাতৃভাষা অবহেলিত এবং অনুশীলনের বড়ই অভাব। তাছাড়া, জাতীয় ভাষা চর্চাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আদিবাসীদের মাতৃভাষা চর্চায় ভাটা পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, শিক্ষিত মা-বাবারা শিশুদের ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানোর দিকে দিন-দিন ঝুঁকে পড়ায় শিশুরা ইংরেজীর পাশাপাশি মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ তুলনামূলক কম পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতনতা এবং কার্যকরী উদ্যোগ প্রত্যাশা করা যায়। যেন শিশুরা আন্তর্জাতিক বা অন্যকোন ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার চর্চা করে।

শৈশব থেকে মাতৃভাষার অনুশীলন ও তা চর্চায় শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। যদি মাতৃভাষা চর্চা না করা হয়, তবে অচিরেই তা বিলুপ্তির সংকট দেখা দিতে পারে। তাই নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেদের এবং শিশুদের মাতৃভাষার জ্ঞান চর্চা এবং তা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানে নিজ সংস্কৃতির বিলুপ্তি। মাতৃভাষা আপন সংস্কৃতি ও সত্ত্বার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মাতৃভাষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে শিশুদের সাহায্য করতে হবে এবং তা চর্চার পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। মাতৃভাষা চর্চা ও মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা করার দায়িত্ববোধ শিশুদের মনে জাগ্রত করতে হবে। মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারলে শিশুরা কখনো সৃজনশীলতা এবং সংস্কৃতি চর্চায় মনোযোগি হতে পারবে না। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তাই অভিভাবকদেরও মাতৃভাষা চর্চা এবং মাতৃভাষায় শিল্প-সাহিত্য চর্চা ও বিকাশে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরা বিকাশে ও মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশে অনুরাগি হয়ে উঠবে।

শৈশবের যেকোন শিক্ষাই তুলনামূলক বেশি স্থায়ী হয়। তাই মাতৃভাষার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলার উপযুক্ত সময় হলো শৈশব। তাছাড়া যেকোন ভাষাই চর্চার অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। এমনিভাবে অনেক মাতৃভাষাই সময়ের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। তাই আমাদের মাতৃভাষাকে চর্চার মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে হবে। মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখার অর্থই হলো নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। তাই, শৈশব থেকেই মাতৃভাষার সাহিত্য চর্চা, পড়া-লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেইসাথে প্রয়োজন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুপ্রেরণা। কেননা মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার এবং বিকাশই আমাদের জাতীয় সত্তাকে উন্নীত করতে পারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কাজেই শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্য দিয়ে বিকশিত হোক মাতৃভাষা এবং এর নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হোক আগামীর সংস্কৃতি। সর্বোপরি, মাতৃভাষার সঠিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুরা হয়ে উঠুক আরো বেশি চিন্তাশীল ও মননশীল এটাই প্রত্যাশা।

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল

সাধারণকালের ৭ম রবিবার (ক)

১ম পাঠ : লেবীয় গ্রন্থ ১৯: ১-২, ১৭-১৮ পদ।
২য় পাঠ : ১ করিন্থীয় ৩: ১৬-২৩ পদ।
৩য় পাঠ : মথি ৫: ৩৮-৪৮ পদ।

ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার সৌভাগ্য: আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই পৃথিবীতে আত্মীয়-স্বজনদের সূত্র ধরে শুধু এবং একমাত্র ঈশ্বরের মনোনীত জাতি খ্রিস্টানগণই সৃষ্টিকর্তাকে "পিতা বা আব্বা" বলে প্রাণ খুলে ডাকতে পারি। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে পিতা বা আব্বা বলে ডাকার সৌভাগ্য আজও হয়নি। তা সম্ভব হয়েছে বাণী ঈশ্বরের দেহগ্রহণের পথ ধরে। পিতা ডাকার সুযোগের মধ্য দিয়ে ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে তোলা অতিমাত্রায় সহজ হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁকে পিতা ডাকার মত ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে আমরা সকলেই (বিশেষ করে যারা তাঁর আলো ও বায়ু দিয়ে বেঁচে আছি) যেন ভাই-বোনের ভালবাসা দিয়ে সকলকে হৃদয় মাঝে স্থান দেই। দোষ-ত্রুটি ধরার কোন স্থান ঈশ্বর রাখেননি; দোষ-ত্রুটি ধরার মতো কোন আদেশও ঈশ্বর দেননি বরং পিতা-সন্তানের সুত্র ধরে পরস্পরকে শুধু ভালবাসার পরামর্শ নয় বরং আদেশ দান করেন।

অপরিচিতদেরকে ভাইবোন ডাকার সূত্র: সকলের সাথে সাথে সুসম্পর্কের নৈকট্য আরো জোড়ালো করার জন্য নির্ভরশীল সূত্র নিজেই কৌশলে গেঁথে দিয়েছেন। যেমন:

যদি আমার চুল বড় হয়, যেন নাপিতের সাথে সুসম্পর্ক রাখি।

যদি মাছ ধরতে না পারি, যেন জেলেদের সাথে সুসম্পর্ক রাখি।

যদি ধর্মীয় ভাষা না বুঝি, যেন ধার্মিকের সাথে সুসম্পর্ক রাখি।

যদি চিকিৎসাশাস্ত্র না বুঝি, যেন ডাক্তারের সাথে সুসম্পর্ক রাখি।

যদি ঈশ্বর আমাকে ধনী করেছেন অথচ ধার্মিকতা দেননি, যেন আমি গরীবের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদেরকে সম্পদ দেবার মধ্য দিয়ে ধার্মিক হবার আশির্বাদ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করি; তবুও যেন ধার্মিকতার দিক থেকে গরীবের সমপর্যায়ে থাকতে পারি।

পিতার আদেশ পালনই পবিত্র হওয়ার উপায়: ঈশ্বরের এমন সুত্র-মাফিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরেও প্রথম শাস্ত্রপাঠ অনুসারে ভাই-প্রতিবেশীতো দূরের কথা কোন জাতির প্রতিও ঘৃণা-বিদ্বেষ না করার আদেশ দেন। কোনো প্রতিবেশী বা জাতি কোনো অন্যায় করলে গঠনমূলক তিরস্কার করা যেতে পারে তাকে ন্যায়ের পথে ফিরে আনার জন্য, কিন্তু প্রতিশোধ, আক্রোশ বা ঘৃণা করা চলবে না। তাঁর এই আদেশ পালনের মধ্য দিয়েই পিতার সন্তানেরা পবিত্র হতে পারে, ঠিক যেমন সন্তানদের পিতা নিজেই পবিত্র। ভালবাসার আদেশ পালন ছাড়া কেউ পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না। পবিত্র জল দিয়ে গোসল করা কিংবা প্রতিদিন পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করায় কোন লাভ নেই যদি অন্তরে না থাকে ভালবাসা।

সন্তানের প্রতি পিতার মর্যাদা: আব্বা ঈশ্বর চান যেন, সকল সন্তান তাঁর বাসস্থানের ভাগ পান অর্থাৎ মর্তপুরে থেকেও যেন স্বর্গপুরের ভাগ আমরা পাই। তাই শুধু আমাদেরকে তাঁর স্নেহ-ভালবাসা ও আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠ অনুসারে আমাদের দেহ ও আত্মাকে তাঁর পবিত্র মন্দির আখ্যা দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। যেন মর্যাদাশীল আব্বা তাঁর সন্তানদের অন্তরে স্বর্গপুরী বানিয়ে নিজেই সেখানে বাস করতে পারেন ঠিক যেমন জগত সংসারের বুড়ো বাবারা মৃত্যুর আগে সন্তানদের জন্য ভালো ঘর বানিয়ে রেখে যান, যাতে বৃদ্ধকালের বাকী সময়টুকু সন্তানের ঘরে থাকতে পারেন।

ঈশ্বরতুল্য পিতা-মাতার বর্তমান পরিস্থিতি: আজকে পিতার সাথে এক পরিবারের সন্তান হয়েও মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত মোশীর বিধানের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা বর্তমান সমাজে আমরা অনেকেই চর্চা করছি। "দুঃসম্পর্ক" শব্দটি যদিও ঈশ্বরের ডিকশনারীতে নেই, তবুও শুধু দুঃসম্পর্কের কোন প্রতিবেশীতো দূরের কথা, ঈশ্বরের সমতুল্য নিজের পিতা-মাতার চোখ উপড়ে ফেলা, দাঁত ফেলে দেয়া, কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পর, আছাড়, অনাহার, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি নিগৃহিত করছে নিজ সন্তানেরা। এগুলো প্রমাণ করে আমরা প্রচণ্ড লোভী। লোভ চরিতার্থ করার জন্য আমরা বেপরোয়া হয়ে ওঠি এবং ঈশ্বরের দেয়া নিজের মন্দিরটি নিজের অমনুষ্যত্বের বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলি, যাতে ঈশ্বর আমার ঘর থেকেও পিতা-মাতার মতো নিগৃহিত হন। এভাবে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে আমরা জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হই।

অপরিপক্ক পিতা-মাতার আধিক্য ও ক্ষতিকর প্রভাব: অবশ্য সন্তানদের দোষ দিয়ে বর্তমান যুগের পিতা-মাতাদের নিস্কৃতি দিতে চাইনা। কথায় বলে: যেমন কর্ম তেমন ফল; যেমন বীজ তেমন গাছ; যে কেউ অস্ত্র ধরে, সে অস্ত্রের আঘাতে মরবে ইত্যাদি। তাই দেখা যায়, বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা যে বয়সেই বিয়ে করুক না কেন, আসলে বিয়ের পরেও তারা ডিজিটাল নাবালক বালক-বালিকার মতো আচরণ করে। যেমন:

বিয়ের আগেও কিছু বাবা বখাটে থাকে, বিয়ের পরেও বখাটে থাকে। বিয়ের আগেও লম্পট, বিয়ের পরেও লম্পট। বিয়ের আগেও একরোখা ও স্বার্থপর, বিয়ের পরেও। আবার কিছু কিছু মেয়ে বিয়ের আগেও স্থানীয় পাড়ার মধ্যে বিশ্বসুন্দরী নায়িকা, বিয়ের পরেও। বিয়ের আগেও স্মার্টফোন, বিয়ের পরেও। বিয়ের আগেও রোজা-নামাজ ও ধর্মহীন, বিয়ের পরেও। কিছু কিছু পরিবারের সন্তানেরা জানেই না যে উপাসনায় কি হয় এবং কেন হয়। তাদের পালক বা যাজকের নাম কি তারা জানে না। অনেক সন্তানেরা তাদের ধর্মীয় নামটাও জানেনা। বর্তমানে নাবালক পিতা-মাতার সংখ্যাও দিন-দিন বাড়ছে, যারা গর্ভের শিশুহত্যাকারী। গর্ভের শিশু যখন মাকে অনুরোধ করে বলে যে, আমার কচি দেহে অস্ত্র ঢুকিয়ে আমাকে হত্যা করো না মা, আমাকে দীর্ঘায়ু দিয়ে বাঁচতে দাও মা প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! কচি শিশুর এমন অনুরোধ যখন নাবালক পিতা-মাতা শোনে না, সেই নিষ্ঠুর পিতা-মাতা বৃদ্ধ হলে ওইসব নিরীহ শিশুদের আত্মা কি তাদের শান্তি আশির্বাদ দেবে, নাকি নরক যন্ত্রণার অভিশাপ দেবে?

যাইহোক, বলছিলাম মার-পিট খাওয়া পিতা-মাতার কথা। এইসব পিতা-মাতার লাম্পট্যের ইতিহাস বা বিশ্বসুন্দরীর পরকীয়ার ইতিহাস যদি সন্তানেরা এক সময় জানতে পারে এবং এসব সন্তানেরা যদি বড় হয়ে অধার্মিক ও বাহুবলী হয়, তবে নিশ্চয় তাদের বাহুবল ঐসব পিতা-মাতার উপর প্রায়োগিক হবেই। তাই বিয়ের আগে বা পরেও পিতা-মাতাকে ওজনশীল ও ব্যক্তিত্বশীল ধার্মিক হওয়া উচিত এবং এখনই এমন সিদ্ধান্ত নেবার সময়।

পিতার আদুরে সন্তানদের পাপ ও ভণ্ডামী: আজকে যারা রবিবারের উপাসনায় অংশ নিচ্ছি, এই মুহূর্তে যদি পিতাক ঈশ্বর নির্দেশ দেন যে, "তোমার ভাই-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোন রাগ বা অভিযোগ থাবলে এক্ষুণি উপাসনালয় ছেড়ে বেরিয়ে যাও, আর তার সাথে আগেরকার সৎভাব ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে আসবে না। তাহলে মনে হয় উপাসনায় শতকরা ২/৪জন বাদ দিয়ে সকলেই উপাসনা থেকে বের হয়ে যেতে হবে এবং অনেকেই শেষ পর্যন্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য ফিরে আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। অথচ এইসব পাপী মানুষগুলো খ্রিস্টভক্ত নাম নিয়ে শ্রেষ্ঠ পবিত্র প্রসাদ গ্রহণ করে চলছে। এসব ব্যাপারে চিন্তা করলে আমরা কিন্তু ফরিশীদের থেকে দশ গুণ ভণ্ড কেননা ফরিশীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে ভণ্ডামী করতো, কিন্তু আমরা ধর্মসহ জগত-সংসারের দশ ব্যাপারে ভণ্ড। তাইতো যিশু বলেন, তোমাদের ধার্মিকতা ফরিশীদের চেয়ে বেশি গভীরতর হতে হবে। নয়তো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব।

সন্তানদের একতা ও পবিত্রতা আহ্বান: তাই প্রিয়জনেরা, আসুন সাংসারিক অর্থে জ্ঞানের জগতে ঘোরাফেরা না করে আবারও পিতার পরিবারের সন্তান হয়ে তাঁর নির্দেশিত স্নেহ-ভালাবাসা ও আদেশের প্রতি অনুরক্ত হই। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, নবীন-প্রবীণ সকলেই পিতার সন্তানত্বেও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত সবাই একত্রে মিলে সবার একতা, পবিত্রতা ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করি নিয়মিতভাবেই॥ ❑

ভস্ম : শুদ্ধ হওয়ার তিলক

ফাদার যোসেফ মুরমু

আদিপুস্তক গ্রন্থে মানুষের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, "সত্যিই তো ধুলো তুমি, ধুলোতেই তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে!" *(আদি ৩:১৯;)*। এ বাণী তপস্যাকালে শুদ্ধ হওয়ার পাথেয়। এ বাণী পুণ্য অর্জনের সিদ্ধবাণী। এই বাণী ভক্তবিশ্বাসীকে তপস্যার অনুচিন্তন দান করে। আদি সময়ে ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা প্রবক্তাদের আহ্বানে অনুতপ্ত এবং পরিবর্তিত ভাবভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার পাথেয় পেয়েছিল। আর এখন খ্রিস্টমণ্ডলী ও পরিবারের লোকেরা ঐ আহ্বান অনুসরণ করে যাচ্ছে। তারা স্বর্গসুখের জন্য ক্ষমা লাভের আশায় ভস্ম বুধবারের মহা আশীর্বাদ নিতে তপস্যার চেতনায় সচেতন এবং মনবিশ্বাস নিয়ে পালনের আয়োজনে অংশ নিচ্ছে। ভক্তদের এই রকম বিশ্বাস যে, ভস্ম বুধবারের একেকটি ছাই-অনুও যেন বৃথা না যায়, বরং ছাই-অনু যেন ব্যক্তির কপালে লেপটে থেকে দেহ-আত্মা শুদ্ধি করে তুলুক। তপস্যাকাল হোক পবিত্রতায় মণ্ডীত।

ভস্ম বুধবারের "ভস্ম" : মণ্ডলীর উপাসনার রীতি-সংস্কৃতি হল, বিগত বছর, তালপত্র রবিবারে ব্যবহৃত খেজুরপাতা থেকে চলতি বছরের জন্য ভস্ম তৈরী করা। সেই 'ভস্ম' তপস্যার শুরুতে ভস্ম বুধবারে পুরোহিত "হে মানব তুমি" প্রার্থনা বলতে বলতে ভক্ত বিশ্বাসীর কপালে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেন। ঐ ভস্ম' বিশ্বাসীভক্তকে দূষিত মনাত্মাকে শুদ্ধি করার শিক্ষা দেয়, পরকালের নামে উৎসর্গ হওয়ার চিন্তা দেয়। 'সাধারণ ছাই-ভস্ম' সংসারে যেমন সাংসারিক তৈজসপত্র পরিস্কার করে, তেমনি পবিত্র এ 'ভস্ম' মানুষের অহংকার, পাপ প্রবণতা, মন্দতা, কুসংস্কার ও অবিশ্বাস থেকে রক্ষার শিক্ষা দেয়। নিনিভবাসীরা জাগতিক ও মানবিক পাপাচার জঞ্জাল থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য ভস্ম' ছাই স্তুপে বসেছিল, সর্বশরীরে মেখেছিল। সেই সাথে পবিত্র মানুষ হওয়ার জন্যে ধর্মগুরুদের নির্দেশবাণী শুনে, উত্তম পথ ও পাথেয় অবলম্বন করেছিল, উদ্ধার পেয়েছিল তারা। ঠিক তাই, এ ভস্ম' ভক্তবিশ্বাসীকে, 'অনুতাপ, ত্যাগস্বীকার, আত্ম-পরীক্ষা ও আমিত্বকে বর্জন করতে শিখিয়েছে, ৪৫দিন প্রার্থনা করতে ডাকছে। ভস্ম' নিজেই আগুনে পুড়ে নিরাকার হয়েছে, মানুষের হাতে এসে পৌঁছে, মানুষ এর অনু মেখেছে কপালে, হুদিস পেয়েছে, পাপ কালিমা ছেড়ে এভাবেই নিঃস্ব হতে হবে, শুদ্ধি করে নিতে দেহ-মন-আত্মা। ভস্ম বুধবার বিশ্বাসীভক্ত মানুষকে তপস্যাকালের শুরু থেকে এই পুণ্য গুণাবলীই ধারণ করতে আহ্বান করছে।

ভস্ম বুধবারে ঐশশক্তি উপস্থিত : ভস্ম বুধবার খ্রিস্টীয় পরিবারে পরিবারে ত্রিত্বের ঐশশক্তি উপস্থিত করে। তাই ভস্ম বুধবার থেকে তপস্যাকালকে আধ্যাত্মিক করণার্থে পারিবারিক পর্যায়ে আধ্যাত্মিক চর্চার সূচী তৈরী হয়। ফলস্বরূপ, উপবাসকালের প্রথম দিবস, ভস্ম বুধবার, যেদিন খ্রিস্টভক্তরা কপালে ভস্ম তিলক মেখে নিশ্চিত্ত করে, যে এখন আত্মা শুদ্ধিকরণের বাহ্যিক ত্যাগস্বীকার করার সময়। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের সময়ও নিকটবর্তী। পালকীয় কর্মসূচী সম্পাদন করতে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের খ্রিস্টভক্তরা পবিরারে ত্যাগস্বীকারের চিহ্নস্বরূপ দিনের খাদ্য-দ্রব্য থেকে একমুঠ চাউল, বাজারের পয়সা থেকে কিছু টাকা হাঁড়িতে জমা রাখে। এরকম ভস্ম বুধবার থেকে পুণ্য শুক্রবার পর্যন্ত চলতে থাকে। এটুকুই নয়, কোন ফকির বাড়িতে ভিক্ষা নিতে আসলে,তাকে উপবাসের চিহ্নস্বরূপ কিছু চাউল বা টাকা দেয়া হয়। শহরের খ্রিস্টভক্তরা চাউল দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না বিধায় কিছু টাকা পয়সা দান করে। আবার অনেক পরিবার আছে, যারা গরীব ব্যক্তিকে কাপড়-লতাও দেয়। মনে করি মন-আত্মাকে শুদ্ধি রাখার এ ধরণের ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন। গ্রাম্য বা শহরের খ্রিস্টভক্তরা এ আদর্শ দীক্ষাগুরু যোহন বা যিশুর মরুভূমির উপাবাসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। পবিত্র ঐ দু'ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের দান ছিল বাড়তি গ্রহণ না করা। তিনি যৎসামান্য গ্রহণ করে, বাকীটা ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি মূল্য দিয়েছেন নিজের আত্মা ও দেহকে বাহ্যিক প্রলোভন থেকে রক্ষা করার। যিশুও চল্লিশ দিন-রাত কোন কিছুই গ্রহণ করেননি, মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি উৎসর্গ হতে এসেছিলেন। এভাবে তিনি তপস্যা ও ত্যাগস্বীকারের আদর্শ মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভস্ম বুধবারের শুদ্ধির ডাক : ভস্ম বুধবারের ডাক হল, প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত যেন পাপস্বীকার সংস্কার নিতে মনোযোগি হয়। সবাই জানে "ভস্ম বুধবার" আত্মা শুদ্ধির অনুপ্রেরণা। উপবাসকালের পালকীয় কর্মসূচীর খ্রিস্টযাগে (সাপ্তাহিক বা রবিবার) গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তদের পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের প্রতি ঝোঁক প্রচুর। পাপস্বীকার করার মনোভাব উপবাসের প্রথম দিবস, ভস্ম বুধবার, থেকেই খ্রিস্টভক্তদের তরান্বিত করে। পাপস্বীকার না করে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। দেখা যায়, খ্রিস্টযাগের আগমুহূর্ত পর্যন্ত নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী পাপস্বীকার করে। তাদের পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস, উপবাসকালে পাপস্বীকার সংস্কার নেয়া খ্রিস্টীয় দায়িত্ব। গ্রাম্য গির্জায় খ্রিস্টভক্তদের পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণে পুরোহিত সুযোগ দেয়। খ্রিস্টভক্তদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি পাপস্বীকার শোনার আসন গ্রহণ করেন। দেখা যায়, গ্রামে উপবাসকালে সুস্থ্যব্যক্তি ছাড়াও অসুস্থ ব্যক্তি, যে কথা বলতে পারে, কানে শুনতে পাই, তিনিও

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রায়শ্চিত্তকাল চিত্তকে নাড়া দেয়

সাগর কোড়াইয়া

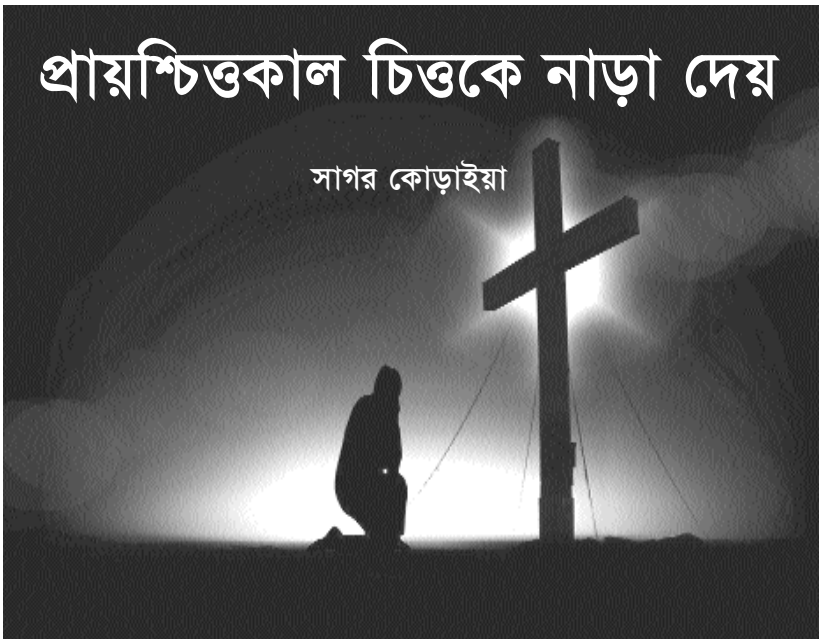

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বর্তমান বরেন্দ্রভূমির প্রকৃতি সবুজে ভরপুর। কয়েক বছর পূর্বেও চিত্র ছিলো ভিন্ন। ঘরের বাহিরে বের হলেই কাঠফাঁটা রোদ। লু-হাওয়া বয়ে যেতো। জলের অভাব ছিলো প্রচণ্ড। কিন্তু যখনই প্রকৃতি জলের স্পর্শ পেতো তখন চারিদিক সবুজে ঢেকে যেতো। সেটা ছিলো মাত্র কিছু সময়ের জন্য। এরই মধ্যে যা একটু-আধটু ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতো তাই নিয়ে কৃষককে থাকতে হতো সন্তুষ্ট। কৃষককে আবার পরের বছরের জন্য করতে হতো অপেক্ষা। আমাদের জীবনটাও পাপের কারণে মাঝে মাঝে বরেন্দ্রের শুষ্কভূমির মতো হয়ে ওঠে। আমাদের প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ কিছুর প্রতি আকর্ষণ। আর এর মাধ্যমে পাপের দাসত্বে পরিণত হওয়া সহজ হয়। প্রথম মানব-মানবী আদম-হবা যেমনটি করেছিলো। পাপ করার পরও আমাদের অনুতপ্ত হওয়ার উপায় রয়েছে। আর তাই প্রায়শ্চিত্তকাল হচ্ছে এমন একটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াক্ষণ বা সময় যা চিত্তকে নাড়া দিয়ে পাপ থেকে শুদ্ধ হওয়ার পথের সন্ধান দেয়। যখনই আমাদের চিত্ত বিবেকের স্পর্শে নাড়া খায় তা যেন হয়ে ওঠে প্রকৃতির জলের স্পর্শ লাভ।

প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের ব্যক্তি জীবনের দিকে তাকাতে সাহায্য করে। আর যখনই আমরা নিজেদের দিকে তাকানোর সাহস করতে পারি তখনই মাত্র ঈশ্বরের দিকে তাকাতে পারি। আর তখনই ঈশ্বরের চোখে আমাদের চোখ পড়ে। আমাদের জীবনে সমস্যা-প্রলোভন আসাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সেখান থেকে ওঠে আসার প্রচেষ্টা থাকাটা জরুরী। যিশুও ঠিক একইভাবে শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সে প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেননি। বরং শয়তানকে দূর করে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদেরও ঠিক যিশুর মতো হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে শয়তানের সমস্ত প্রলোভনকে প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে জয় করার শক্তি যোগায়।

মানব জীবনটা ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে নিয়েই পার্থিবময় অবস্থাটাকে অতিক্রম করতে হয়। আবার আমাদের জীবনে পাপ-পুণ্য বলে দুটি দিক রয়েছে। পাপ আসে শয়তানের নিকট থেকে আর ঈশ্বরের কাছ থেকে পুণ্য। আর এই পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডেই আমাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। যিশুই আমাদের জীবনে সে পুণ্যের দর্শন দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে আমাদের মানবিক হয়ে উঠতে হয়। আর মানবিক হওয়ার পথের সন্ধান যিশুই আমাদের দেখান। পুণ্যের পথে চলে মানবিক হওয়ার সন্ধান যিশু ভ্রাতৃপ্রেমের আলোকে দিয়েছেন। যিশু প্রত্যেক মানুষের মাঝেই বাস করেন বিধায় যখনই আমরা মানবিকতার স্পর্শে আলোকিত না হয়ে কোন অসহায়ের প্রতি কিছু না করি তখন তা যিশুর প্রতিই অবহেলাকে প্রকাশ করে। তাই এই অমানবিকতার পথে চলা মানুষকে ছাগ আর পুণ্যের পথের মানুষকে মেষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের চিত্তকে নাড়া দিয়ে জানিয়ে দেয় আমরা ছাগ না মেষ।

'কথার জোরে চিড়া ভিজে না' বলে একটি প্রবাদ রয়েছে। তাই কথার চেয়ে জীবনের সাক্ষ্যটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবার সরবতার চেয়ে নীরবতার জোর বেশি। নীরবতার মধ্য দিয়ে প্রার্থনার আসল স্বাদ পাওয়া যায়। আর প্রার্থনা করার চেয়ে প্রার্থনাশীল হয়ে ওঠার শিক্ষা দেয় প্রায়শ্চিত্তকাল। আমরা অনেক সময় মনে করি প্রার্থনা যত বেশি জোরালো ও উচ্চমার্গের হবে ঈশ্বর বুঝি সে প্রার্থনা শুনে থাকবেন। কিন্তু সেটা একটা ভুল ধারণা। কারণ ঈশ্বর আমাদের মনের কথা জানেন ও বুঝেন। প্রার্থনা হয়ে উঠতে হয় সবার মঙ্গলের জন্য; তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রার্থনা স্বার্থপরতারই নামান্তর। এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের প্রার্থনা যেন হয়ে ওঠে যিশুর শেখানো প্রার্থনার মতো। যেখানে থাকবে না কোন ব্যক্তিস্বার্থ; বরং সকলের মঙ্গল সাধনের প্রার্থনাই যেন আমাদের কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বর বুঝি এখন আর আশ্চর্য কাজ করেন না। কিন্তু আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই আশ্চর্যকাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু সে আশ্চর্যকাজগুলোকে বুঝতে ও আবিষ্কার করতে আমাদের বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে হয়। অনেকবার আমরা যিশুর কথামতো, অসৎ এই প্রজন্মের লোকদের মতো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজগুলোকে বুঝতে চাই না। এই যে প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে কত মানুষ নানাভাবে মারা যাচ্ছে, কিন্তু আপনি, আমি ও আমরা প্রতিদিন এখনো বেঁচে আছি ঈশ্বরের বদান্যতায় এটাইতো আমাদের জীবনের একটি বড় আশ্চর্য কাজ। আর এ অবিশ্বাস পাপেরই নামান্তর। তাই আমাদের পাপের জন্য প্রতিনিয়ত অনুতাপ করতে হয়; আর তা করতে না পারলে দেখা যায় অন্যেরা অনুতপ্ত হয়ে বরং আমাদের আগে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে স্বর্গরাজ্যে বসবাস করার সুযোগ পাবে। প্রায়শ্চিত্তকাল পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রেমময় পিতা ঈশ্বর আমাদের দিকে প্রতিনিয়ত, প্রতিক্ষণ তাকিয়ে আছেন। সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীর সবাই পায় তেমনি তাঁর ভালবাসা ও করুণার দৃষ্টি সবার দিকে রয়েছে। কিন্তু আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি দিই না। তিনি আমাদের কণ্ঠ শুনতে চান কিন্তু আমরা তাঁকে ডাকি না। আমরা যেন তাঁর কাছে চাই কিন্তু তিনি সেই চাওয়ার ভঙ্গিমা আমাদের মাঝে দেখতে পান না। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনে ক্লান্ত হন না। ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার পরে না পেলে আমরা ভগ্নবিষন্ন মনে ঈশ্বরের প্রতি ভরসা ছেড়ে দিই। যা কখনো হওয়া উচিত নয়; ঈশ্বর জানেন আমাদের কোনটা প্রয়োজন আর প্রয়োজনানুযায়ী তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিতে ভুল করেন না; তিনি যখন দেন সেরাটা দিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের অন্যের দিকেও তাকাতে হয়। নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে অন্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিজের প্রতি অন্যেরা যা করবে বলে আশা করি তেমনি অন্যের প্রতিও তা করার লক্ষ্য স্থির করাটাই শ্রেয়।

প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধিকাল। আর এই শুদ্ধিক্রিয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। নিজেদের আত্মসংযম ও অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনই প্রায়শ্চিত্তকালের সকল মানদণ্ড পূরণ করতে পারে। মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশই আমাদের লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে আমাদের ধর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে হয়। ধর্মনিষ্ঠ হতে গেলে শুধুমাত্র মুখের কথায় সম্ভব নয়; বরং ধর্মনিষ্ঠার সমস্ত দিক পূরণ আবশ্যক। প্রায়শ্চিত্তকালে উপবাস শুধুমাত্র না খেয়ে থাকা নয়। কিন্তু আসল উপবাস হচ্ছে নিজের আমিত্বকে পরিহার করে চলা। আমিত্বের কারণে অন্যকে অবহেলা করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে জন্ম নেয়; তাই আমিত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সেখানে ভ্রাতৃপ্রেমের প্রাচীর গড়ে তোলাই হোক উপবাসকালের ধ্যান ও প্রার্থনা।

অন্যকে ভালবাসা ও পবিত্র হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা আমরা যিশুর কাছ থেকে পাই। যিশু মানুষকে ভালবেসে জীবন দিয়েছেন আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পবিত্র অবস্থা থেকে আরো ঊর্ধ্বে উঠেছেন। তাই ভালবাসা ও পবিত্রতার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। ভালবাসা দ্বারা সব কিছু জয় করা যায়। ভালবাসা তাই ভালবাসাকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। একদিন ভালবাসার মানদণ্ডেই আমাদের পুরস্কৃত করা হবে। যিশুই পৃথিবীতে একমাত্র মহামানব যিনি শত্রুকেও ভালবাসার কথা বলেছেন। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করে শুধুমাত্র যারা আমাদের ভালবাসে তাদেরই যে শুধু ভালবাসবো তা নয় বরং শত্রুকেও ভালবেসে কাছে টেনে নিবো। প্রায়শ্চিত্তকালে মাতামণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দেয় যাতে আমরা পবিত্র হয়ে ওঠি। আমাদের কথা, কাজ, ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-প্রার্থনা, মনন তথা সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে যাতে পবিত্র হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকে। পবিত্র হওয়ার পথে পিতা ঈশ্বর আমাদের সামনে পবিত্রতার আকর হয়ে আছেন।

প্রায়শ্চিত্তকাল যে আমাদের প্রত্যেকের চিত্তকে একইভাবে নাড়া দেবে তা নয়। বরং চিত্তের সে নাড়া ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োজনানুযায়ীই সংঘটিত হতে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে চিত্তের সে নাড়াকে বুঝতে আমাদের প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। দিন যাপনের প্রতি মূহুর্তে নানা শক্ত আবরণে আমাদের চিত্ত ঢাকা পড়ে যায়। চিত্ত হয়ে পড়ে স্থবির, কর্মহীন। পাপে নিমজ্জিত হয়ে চিত্ত চিত্তের সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলে। যেহেতু প্রায়শ্চিত্তকাল মাণ্ডলীক জীবনে বছরে একবারই আসে তাই প্রায়শ্চিত্তকালের আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতে হয়। কারণ প্রায়শ্চিত্তকাল চিত্তে নাড়া দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলে॥ ❑

ভস্ম : শুদ্ধ হওয়ার তিলক

(৭ পৃষ্ঠার পর)

পাপস্বীকার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পুরোহিত, অসুস্থ ব্যক্তির পাপস্বীকার শুনেন এবং (প্রয়োজন হলে অন্তিমলেপন দেন) এবং খ্রিস্টপ্রসাদ দেন। এতে ব্যক্তি সত্যিই আত্মা ও মনে সুস্থবোধ করে, আত্মার দূষিত প্রভাব থেকেও নিষ্কৃতি লাভ করে। শহরের খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে পুরো ৪৫দিন নানান পর্যায়ের নারী-পুরুষ উপবাস করে ঠিকই, কিন্তু পাপস্বীকার নেয়ার ব্যাপারে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তা দিনের আলোর মতই সত্য। তারপরেও অনেকেই আত্মার শুদ্ধি লাভের জন্যে পাপস্বীকার করে। তবে গ্রাম বা শহরের কোন পর্যায়ের ব্যক্তিরাই ১০০% পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে না। মাঝে-মধ্যে কেন জানি খ্রিস্টভক্তরা ভুলে যান যে, তপস্যাকালে পাপস্বীকার সংস্কার নেয়া আবশ্যক, পাপমুক্ত হওয়ার প্রয়োজন। যাহোক, উপবাসকালে অনুতাপ ও অনুশোচনা করে শুদ্ধি হওয়া এবং পাপস্বীকার করে পাপের দণ্ডমোচন করার সময়।

ভস্ম বুধবারের নির্দেশনা : কপালে 'ভস্ম' দেয়ার সময় পুরোহিত, যে বাণীটি বলেন, তা খ্রিস্টভক্তকে জানিয়ে দেয়, তার জীবন অমর নয়। যেখান থেকে তার মর্তে আগমন ঘটেছে, সেখানেই ফিরে যেতে হবে। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে তার দেহ, ঈশ্বরের কাছে যাবে শুধু আত্মা। আবার ভস্ম বুধবার খ্রিস্টভক্তকে উপবাসকালের ৪৫টি দিন পূরণের দিকে যেতে দৃষ্টি দিয়ে বলে, 'নিজেকে মূল্যায়ন করো, মনুষ্য দেহের মন্দতা খুঁজে বের করো, শয়তানের বেড়া ছিড়ে ফেল, আত্মা শৃংখলমুক্ত করো' ইত্যাদি। চ্যালেঞ্জিং এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন, এর শক্তি হল মগ্ননিবিষ্ট প্রার্থনা, আমিত্ব বিতাড়ন, পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ এবং পারত:পক্ষে দৈনিক পবিত্র শাস্ত্রবাণী অনুধ্যান করা। সেই সাথে প্রায়শ্চিত্তকালের প্রতি শুক্রবার যিশুর ক্রুশপথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বা হাঁটু গেড়ে ক্রুশপথ করা। এভাবেই পয়তাল্লিশ দিনে বিভিন্ন উপবাস করে আত্মার শুদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রায়শ্চিত্ত, একজন উপবাসী ও পবিত্রতার সাধককে যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করবে ও পুণ্য অর্জনে স্থির রাখবে।

এসবের অন্তিম কথা হ'ল, একজন খ্রিস্টভক্তকে পুণ্য উপবাসকালের ৪৫ দিনে, দৈহিক প্রায়শ্চিত্তের আত্মিক শক্তি আত্মপ্রত্যয়ী করবে। ভস্ম বুধবারের ভস্ম ও উপবাসকালের তপস্যা খ্রিস্ট যিশুর ক্রুশের বাহক ও পুনরুত্থানের ঘোষক করবে, এবং ৪৫দিনের সাধনায় পূণ্য অর্জনের লক্ষ্য পূরণ হবে। ❑

প্রায়শ্চিত্তকাল : নতুন জীবন ...

(১১ পৃষ্ঠার পর)

১০। রাগ পুষিয়ে না রেখে প্রকাশ করা। ভিক্ষুক যদি কিছু চায় তাকে যেন কখনো না ফিরিয়ে দিই সামর্থ থাকলে যেন কিছু দান করি। প্রার্থনায় ও সৎকাজে সময় দেওয়া এবং ধার্মিকতা বাড়ানো। কথায় বা ব্যবহারে যেন কাউকে আঘাত না দিই।

উপসংহার: তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল মূলত আমাদের জীবন ধারায় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় মহত্তর সাধনার পথ। তাছাড়া তপস্যাকাল প্রভু যিশু খ্রিস্টের যাতনাভোগ-মৃত্যু ও আমাদের দীক্ষাস্নান স্মরণে অন্তরে নতুন মানুষ হবার আহ্বান জানায়। তাই আসুন এই আহ্বানে সারা দিয়ে প্রভু যিশুর যাতনাভোগের অংশী হয়ে আমরাও যেন প্রত্যেকে নতুন মানুষ হয়ে ওঠি, তপস্যাকালে এই প্রতিজ্ঞা হোক আমাদের সবার। কপালে ছাই মেখে আত্মশুদ্ধিতে নতুন জীবন লাভের জন্য নিজেরা যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি প্রায়শ্চিত্তকাল শেষে আমরা যেন আমাদের জীবনকে নতুন করে সাজাতে পারি। নিজেরা যেন আরো ঈশ্বরময় হতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সেই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আরো বেশি করে দান করুন॥

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. *উপাসনা-সহায়ক, ক পূজনবর্ষ, বাংলাদেশ উপাসনা পরিষদ - ২০০২।*

২. *উপাসনা-সহায়ক, খ পূজনবর্ষ, বাংলাদেশ উপাসনা পরিষদ - ২০০৬।*

৩. *লুইস, সুশীল ফাদার: তপস্যাকাল: জীবন পরিবর্তনের কাল, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা-৬, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।*

৪. *সীমা, ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ ও ফাদার বার্ণার্ড পালমা (কর্তৃক সম্পাদিত): দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথলিক বিশপ-সম্মিলনী, ১৯৯০।*

৫. *The Catholic Encyclopedia for School and Home. 1965, v.6, s.v. 'Lent' by John C. Calhoun, P. 341-342.*

৬. *Ibid.. 1965, v.5, s.v. 'Holy Thursday' by William J. O'Shea, P. 255-258.*

৭. *New Catholic Encyclopedia. 2nd Edition, v. 3, s.v.'Lent' by W. J. O'heat, p.468-470.*

৮. *Pereira, Fr. Louis S: Class Lectures. Second Year, Second Semester 2012.* ❑

প্রায়শ্চিত্তকাল: নতুন জীবন লাভের বসন্তকাল

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

ভূমিকা : কপালে ছাই মেখে আমরা প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি। সেই সাথে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় 'হে মানব মনে রেখো তুমি ধূলিমাত্র আর একদিন ধূলিতেই মিশে যাবে। যা আমদেরকে সচেতন করে যে, এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা, সুন্দর সুন্দর বাড়ি-গাড়ী যা আমরা এতা পরিশ্রম করে তৈরী করেছে তা একদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে। তখন আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি দয়া হবে। আর আমাদের জীবনের মান-অহংঙ্কার, একটু সম্পত্তির জন্য দলাদলি, হিংসা-অহংঙ্কার তার কোন অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই মণ্ডলী আমাদের একটা সুন্দর সুযোগ দেয়। যেন কপালে ছাই মেখে আত্মশুদ্ধিতে নতুন জীবন লাভের জন্য নিজেরদের প্রস্তুত করি এবং যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সহভাগি হই আমাদের জীবনের ছোট্ট ছোট্ট ত্যাগস্বীকার ও সেবাকাজের মধ্য দিয়ে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিসিয়া ধর্মমহাসভায় ৪০ দিন তপস্যাকালের প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও ৩৬০ খ্রিস্টাব্দে লাউডিসিয়ে ধর্মাসভার পর থেকে মণ্ডলীতে সর্বত্র ৪০ দিন তপস্যাকাল উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ত্রাণকর্তা প্রভু খ্রিস্টের যাতনাভোগ-মৃত্যু-পুনরুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে খ্রিস্টমণ্ডলীতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রায়শ্চিত্তকাল উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। খ্রিস্টের চল্লিশ দিন উপবাসের *(মথি ৪;২)* স্মরণে ও অনুকরণে খ্রিস্টভক্তরা চল্লিশ দিন নির্ধারিত করেছিল উপবাস, প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য। রবিবার দিনগুলোতে উপবাস করা হত না বলে এবং পুরোপুরি চল্লিশ দিন উপবাস করার সুযোগ দেওয়ার জন্য মোট ৪৬ দিন প্রায়শ্চিত্তকাল ধার্য করা হয়েছিল।" তাছাড়া বরিবার হল প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থানের স্মরণ দিবস, তাই এ দিনে উপবাস করা হয় না বিধায় ছাই বুধবার থেকে পুণ্য শনিবার পর্যন্ত ৪৬ দিন হলেও ৬ রবিবার (৬দিন) বাদ দিয়ে ৪০ দিন গণনা করা হয়। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে তপস্যাকালে উপবাস রাখার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তৎকালে উপবাসকালে, এমনকি খ্রিস্টের পুনরুত্থান স্মরণ দিবস রবিবারেও মাছ, মাংস, ডিম বা আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে এবং দিনে শুধুমাত্র একবার খাবার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হয়। কিন্তু নবম শতাব্দীতে এ প্রথাটি কিছুটা শিথিল করা হয়। ১৩ শতাব্দীতে উপবাসের সময় তরল ও হাল্কা খাবার গ্রহণ ও ১৫ শতাব্দীতে দুপুরে খাবার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়। আবার ট্রেন্ডমহাসভা উপবাসের চেয়ে অনুতাপ ও দয়ার কাজ, দান, সৎ কাজ করার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু পরবর্তীকালে, পোপ ষষ্ঠ পল (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ভস্ম বুধবার ও পুণ্যশুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্কদের বাধ্যতামূলক মাংসাহার ত্যাগের বিধান জারি করেন। এছাড়া অন্যান্য শুক্রবারেও মাংসাহার ত্যাগের বিধান দেন।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকালের অর্থ: তপস্যাকালের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Lent' শব্দটি এসেছে মধ্য যুগের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Leinte' অথবা 'Lente' থেকে, যার অর্থ হল 'বসন্ত' বা (Season of Spring)। তাই বলা যায়, তপস্যাকাল হল- পাপ থেকে মন পরিবর্তনের ও আত্মশুদ্ধির বসন্তকাল। প্রভু যিশু খ্রিস্টের যাতনাভোগ, ক্রুশ-মৃত্যু, পুনরুত্থান স্মরণে ও খ্রিস্টভক্তদের আত্মশুদ্ধি, পাপ থেকে মন পরিবর্তনের লক্ষ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর পূজন বর্ষে তপস্যাকালকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশ করি। প্রায়শ্চিত্তকালে বা তপস্যাকাল হল আত্মশুদ্ধির কাল, তপস্যা বা সাধনার কাল। অন্যথায় বলা যায় যে, তপস্যাকাল হল ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের কাল। এই সময় আমরা আমাদের জীবনের কু-প্রভৃত্তি ত্যাগ করি, মন পরিবর্তন করি, দূষিত জীবনের পরিবর্তন ঘটায় এবং জীবন স্বামী প্রভু যিশুর সাথে সংযুক্ত থেকে পথ চলি।

কপালে ছাই মেখে কেন তপস্যাকাল শুরু হয়: ভস্ম বুধবারে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম-হবার পাপ ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর কপালে ছাই লেপন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, 'হে মানব মনে রেখ তুমি ধূলি আর ধূলিতেই মিশে যাবে।' "দেহে ভস্ম মেখে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও মন পরিবর্তনের জন্য।" এছাড়াও অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণের প্রতীক হিসেবে ভস্ম বা ছাই ব্যবহার হয়ে আসছে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গণনা পুস্তক-১৯, জুডিথ-৯ ও যোনা-৩ অধ্যায়সমূহে ছাই বা ভস্ম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া, ভস্ম বা ছাই ব্যবহারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল: **ক)** ভস্মমূলত পরিষ্কারক অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যকে পরিশোধনের ন্যায় আমাদের কুপ্রবৃত্তিগুলোকেও দূরীভূত করে ও অন্তরকে সূচি করে। **খ)** ভস্ম উদ্ভিদকে ক্ষতিকারক পোকা হতে রক্ষা করে। তেমনিভাবে তা আমাদের মন্দতার সংস্পর্শ হতে সুরক্ষা করে। অন্যথায় বলা যায় যে, ভস্ম বা ছাই মানুষের কাছে যেমন মূল্যহীন, তেমনি এ ছাই আমাদের কপালে মেখে আমরাও স্মরণ করি যে এ দেহ মূল্যহীন এবং তা একদিন ধূলিতেই মিশে যাবে। "খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে রোম নগরে ভস্মবুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। অনুতাপ-সূচক প্রায়শ্চিত্তকালের আরম্ভ হিসেবে তৎকালীন খ্রিস্টভক্তরা নিজেদের অনুতপ্ত পাপীরূপে স্বীকৃতি দিয়ে ললাটে ভস্ম-লেপন গ্রহণ করত ভস্ম বুধবারে। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে প্রায়শ্চিত্তকাল আরম্ভ হত প্রায়শ্চিত্তকালের প্রথম রবিবার থেকে। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর অর্ধা-অর্ধিতে প্রায়শ্চিত্তকালকে আরো চারদিন বাড়িয়ে প্রথম রবিবারের আগের বুধবার পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়।"

তপস্যাকালের বৈশিষ্ট: "তপস্যাকালের বৈশিষ্ট্য বহনকারী দু'টো উপাদান– তথা দীক্ষাস্নান স্মরণ বা দীক্ষাস্নান গ্রহণের প্রস্তুতিকাল এবং প্রায়শ্চিত্তকাল এ দু'টোর উপরেই উপাসনায় এবং উপাসনা বিষয়ক শিক্ষাদানে আরো বেশি জোর দিতে হবে। এ দু'টোর মাধ্যমেই মণ্ডলী তার জনগণকে পুনরুত্থান পর্বের জন্য প্রস্তুত করে, যে প্রস্তুতিকালে তারা আরো ঘন ঘন ঐশবাণী শ্রবণ করেন এবং আরো বেশি সময় প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন" *(২য় ভাতিকান মহাসভা, পুণ্য উপাসনা, নং-১০৯)*। ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম বা ছাই মেখে এই সুন্দর

দিনটির সূচনা হয়। তাই ভস্ম বুধবার থেকে আরম্ভ করে পুণ্য বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনুতাপসূচক সময়টিকে তপস্যাকাল বলা হয়। যিশুর যাতনাভোগ ও গৌবরময় মৃত্যু ও পুনরুত্থানে আমাদের অংশগ্রহণের চিহ্ন হিসাবে দেহে ছাই বা ভস্ম মেখে আমরা আমাদের দুর্বল স্বভাবের কথা চিন্তা করি এবং অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত, দয়ার কাজ, সৎ কাজ ও মন পরিবর্তনের দ্বারা নতুন হবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলি।

কেন এই চল্লিশ দিন : ভস্মবুধবারে কপালে ভস্ম গ্রহণ করে আমরা ৪০ দিনের একটি বিশেষ যাত্রা, একটি বিশেষ কাল, প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকাল আরম্ভ করি। পবিত্র বাইবেলে এই ৪০ সংখ্যাটির উল্লেখ আছে বেশ কয়েকবার এবং গুরুত্ব রয়েছে। উপরন্তু ৪০ সংখ্যাটি একটা দীর্ঘ প্রস্তুতিকালের ইঙ্গিত বহন করে। প্রবক্তা নোয়া'র সময়ে মহাপ্লাবনের স্থায়িত্ব ছিল ৪০ দিন ও ৪০ রাত। প্রাচীনকালে ইস্রায়েল জাতি ৪০ দিন ধরে প্রস্তুত হতো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। মনোনীত জাতিকে তথা ইস্রায়েল জাতিকে ৪০ বছর ধরে মরু অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত রাজ্যে প্রবেশের আশায়। প্রবক্তা মোশী ৪০ দিন-রাত সিনাই পর্বতে থাকার পর ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লাভ করেন। ঈশ্বরের পর্বতে পৌঁছতে প্রবক্তা এলিয়ের ৪০ দিন সময় লেগেছিল। প্রবক্তা যোনা নীনীভে'র লোকদের ৪০ দিন সময় দিয়েছিলেন মন পরিবর্তনের জন্য। দাউদ রাজার রাজত্বকাল ছিল ৪০ বছর। তাছাড়া, প্রকাশ্য জীবন আরম্ভের পূর্বে যিশু খ্রিস্ট ৪০ দিন - রাত প্রার্থনা ও উপবাস করেন এবং পুনরুত্থানের ৪০ দিন পরে যিশু স্বর্গারোহণ করেন। পরবর্তীকালে মূলত প্রভু যিশুর প্রকাশ্য জীবন শুরুর পূর্বে ৪০ দিন ও রাত প্রার্থনা ও উপবাসের স্মরণে ও অনুকরণে মাতামণ্ডলী এই ৪০ দিনের উপবাসকালের সূচনা করে।

তিনটি স্তম্ভ : প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষা দান: তপস্যাকালের উপবাস থাকার ধারণাটি মূলত দীক্ষাপ্রার্থীদের দীক্ষা গ্রহণের পূর্বের উপবাস রাখার ধারণা থেকে এসেছে। কেননা, প্রথম শতাব্দীতে মূলত দীক্ষাপ্রার্থীরা দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি স্বরূপ দীক্ষাগ্রহণের দিন (পুণ্য শনিবার) উপবাস রাখতেন। এছাড়াও ইহুদী সমাজেও বিভিন্ন কিছুর প্রস্তুতি স্বরূপ কিছু ঘন্টা ও নিস্তার পর্বের ভক্তিপূর্ণ প্রস্তুতিস্বরূপ ১ (এক) দিনের উপবাস রাখার প্রচলন ছিল। মূলত প্রথম দিকে উপবাস বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতিকাল হিসাবে শুরু করা হলেও পরবর্তীকালে তা প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তকালে রূপ লাভ করে। উপরন্তু প্রায়শ্চিত্তকালে খ্রিস্টীয় জীবনকে নবায়ন ও শুদ্ধতার চিহ্ন স্বরূপ মাতামণ্ডলী ঐশজনগণকে প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদানের মাধ্যমে কৃচ্ছ্রতা সাধনের পথে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু "তপস্যাকালের প্রায়শ্চিত্ত শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও একান্ত নিজস্ব নয়, বরং বাহ্যিক এবং সামাজিকও। বর্তমান কাল, বিভিন্ন পরিস্থিতির উপযোগী করে প্রায়শ্চিত্তমূলক আচারাদি উৎসাহিত করা আবশ্যক" *(২য় ভাতিকান মহাসভা, পুণ্য উপাসনা, নং-১১০)*। তাছাড়া উপবাস রাখার পাশাপাশি এই ৪০ দিন ধরে যিশুর জীবন , কাজ ধ্যান করে, সৎ কাজ, প্রার্থনা, ধর্মকর্ম, দান ও দয়ার কাজ করে জীবন পরিবর্তন করতে প্রত্যেকেই উপযুক্ত সময় ও সুযোগ লাভ করে। এই তপস্যাকালে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ প্রভু যিশুর যাতনাভোগ ধ্যান ও প্রার্থনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে, স্বার্থত্যাগ করে অন্যের জন্য ভাল কিছু করা, সৎ পরামর্শ প্রদান, নিজের কথা, কাজ ও আচরণ পরিবর্তন, একটু বেশি সময় কষ্টে থেকে যিশুর কষ্টকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করার প্রতি গুরুত্বারোপ ও সুযোগ দান করে থাকে।

আমরা ক্রুশের পথ কেন করি : চতুর্থ শতাব্দীতে জেরুশালেমে, জৈতুন পর্বত, গেৎসিমানি বাগান, কালভেরী পর্বত ইত্যাদি জায়গাগুলোতে মহাগির্জা বা মহামন্দির নির্মাণ করা হয়। তৎকালে ঐ সকল পুণ্যস্থানে, পূণ্য সপ্তাহের, পুণ্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ও পুণ্য শুক্রবারে সকলে ভক্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করে শাস্ত্রপাঠ ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যিশুর যন্ত্রণাভোগ স্মরণানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পবিত্র নগরী জেরুশালেম ফিরে পেয়ে পিলাতের আদালত থেকে কালভেরী পর্যন্ত যিশু যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরে ভক্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাঠের ক্রুশ কাঁধে বয়ে নিয়ে 'দুঃখের পথ' অনুসরণ করার প্রচলন শুরু হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্ট *(১৭৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ)* ক্রুশের পথের চতুর্দশ বা চৌদ্দটি স্থান নিয়ে তপস্যাকালের প্রতিটি শুক্রবারে আমরা ধ্যান প্রার্থনা করি তা নির্ধারণ করেন। আমরা 'ক্রুশের পথ' অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র দু'হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি স্মরণ করি তা নয় কিন্তু যিশুর মর্মযন্ত্রণারই বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে ধ্যান করি।" কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায় যে, মানুষ খ্রিস্টযাগের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে ক্রুশের পথের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে ভক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রায়শ্চিতকালে আমরা কি কি ত্যাগস্বীকার ও সেবাকাজ করতে পারি:

১। উপবাসের মধ্য দিয়ে যিশুর ক্রুশের কষ্টের সহভাগি হওয়া এবং উপবাসের সমপরিমাণ খাবার বা অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে দান করা।

২। আমাদের জীবনের কু-প্রভৃত্তি যেমন: রাগ, হিংসা, অহংঙ্কার, অন্যের সমালোচনা করা, অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা পরিহার করা।

৩। কমপক্ষে যে কোন একটি বদ অভ্যাস ত্যাগ করা যেমন - সিগারেট, মদ, পান, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ, খাবার অপচয়, প্রার্থনা না করা কিংবা রবিবার দিনে গির্জায় না আসা কিংবা টাকা অপচয় করা ইত্যাদি থেকে সংযত থেকে সেই পরিমাণ অর্থ গির্জায় অথবা দরিদ্রকে দান করা।

৪। মোবাইলে, ফেইসবুকে, মেসেঞ্জারে কিংবা ইমোতে ভিডিও কলে কম কথা বলে কিংবা কম এমবি খরচ করে কিংবা ভিডিও না দেখে সেই সময়টুকুতে ভাল কাজ যেমন প্রার্থনা করা এবং বেঁচে যাওয়া টাকা দরিদ্র বা অসহায় কাউকে দান করা।

৫। নিজের বাড়িতে কিংবা নিজের এলাকায় কোন অসুস্থ রোগী কিংবা বৃদ্ধা-বৃদ্ধা থাকলে তাদের সেবা করা, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দান করা এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

৬। প্রিয়জনকে কিছু সময় বেশি দেওয়া ও তাদের সাথে আরো আন্তরিকভাবে সুন্দর ব্যবহার ও সহভাগিতা করা।

৭। টিফিনের টাকা জমিয়ে কিংবা ফোনের টাকা জমিয়ে কিংবা বাজারের টাকা জমিয়ে দান করা।

৮। নিজে ব্যবহার করিনা সেইসব ভাল ভাল জিনিস বা কাপড় বা আসবাবপত্র গরিবকে দান করা।

৯। যাদের সাথে মিল নেই তাদের সাথে মিলন ঘটানো। অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া।

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একুশের ভাবনা

লেনার্ড রোজারিও

এ দেশের মানুষের জীবন ও ইতিহাস সংগ্রাম মুখর। মোঘল আমল থেকে শুরু করে বাংলার আপামর জনসাধারণ সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা যেনে এদেশের মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে। বাংলার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথপরিক্রমায় বাঙালিদের লড়তে শিখিয়েছে এবং লড়তে হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপশক্তির বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় শতাধিক বছরের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ দিনগুলো বাংলার শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস আর ভূগোলে নব নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মতো এই ভূখণ্ডও গর্জে ওঠেছিল প্রচণ্ড গর্জনে। জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিবানে ঝলসে ওঠেছিল পথপান্তরে, নদীবন্দর আর চমকে ওঠেছিল শাসকচিত্ত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত বলেই জমিন রক্ষায় জনগণ হয়েছিল উত্তাল। সমগ্র বাংলা জুড়ে আগুনের যে লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠেছিল তারই নাম তেভাগা আন্দোলন, হাংজ বিদ্রোহ, নাচোল সশস্ত্র সংগ্রাম, পলো বিদ্রোহ, লবন বিদ্রোহ, সান্তাল বিদ্রোহ সহ অন্যান্য বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চলে গিয়েছিল বটে কিন্তু যাওয়ার আগে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশের মানুষ যেন লড়তেই থাকে, সেই ধারাবাহিকতা ছড়িয়ে পড়েছিল ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে সর্বজনীনভাবে। এই আন্দোলনে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহ করা শুরু করে। এই আন্দোলনে ঘরে বসে কেউ অযথা সময় নষ্ট করে নি। সবার মধ্যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার তেজস্ক্রিয়তার ভাব ফুটে ওঠেছিল।

বাঙালির জাতির ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটির তাৎপর্য অকল্পনীয়। যা বলে শেষ করা যাবে না। এ দিনটির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল আরও দুটি দিন। যে দু'টি দিন আমাদের জাতি সত্ত্বার সাথে মিশে একাত্ম হয়ে আছে। ২৬ মার্চ আর ১৬ ডিসেম্বর। তিনটি দিনের তাৎপর্য তিন রকম হলেও লক্ষ্য কিন্তু একটিই ছিল। এই তিনটি দিন আমাদের প্রত্যেকের কাছে সম এবং পবিত্র অর্থ বহন করে। এ দিনগুলো যেন একটি অন্যটির পরিপূরক। এ দিনগলোকে আমরা কখনও আমাদের জীবন থেকে বাদ দিতে পারব না তা আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বাংলাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কোনদিনও বাংলা রাষ্ট্রভাষা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা বা রাজসভার ভাষা ছিল যথাক্রমে ফার্সি, পালি, সংস্কৃত এবং ইংরেজী, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। ইংরেজ আমলের শেষ ১১০ বছর ইংরেজী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী ঘোষণা করল যে, উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন বাঙালিরা এ ঘোষণাকে কেবল সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিক আঘাত বা

শোষণ হিসেবে উপলব্ধি করেনি। এর মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের কালোছায়াও অনুভব করেছিল। সেই অনুভব থেকেই রাষ্ট্রভাষা আদায়ের দাবিতে সকলে একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ে।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত জোরদার করতে থাকে পাকিস্তানী এদেশীয় দোসরদের যোগসাজে। বিভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণ মানস তৎকালে তমদ্দুন মজলিসকে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত পরিষদের নেতৃত্বের একাংশের দুর্বলচিত্ত, সংগ্রামে অনীহা এবং আদর্শ চিন্তায় বিরোধিতা আন্দোলনকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছিল। এমন সময় ১১ মার্চ ১৯৪৯ আন্দোলনে ডাক আসে। প্রগতিশীল ও অসাম্প্রাদয়িক ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন নিজ দায়িত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং অনেককে গ্রেফতার করে। যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক টিকেট, খাম, পোস্টকার্ড, রেটিকেট, টাকাসহ সর্বক্ষেত্রে। বাংলা ভাষা একেবারে পরিহার করার যে প্রকাশ ঘটেছিল তা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসেই বিভিন্ন সভা সমিতি ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে সেই ঘৃণা জমতে জমতে ১৯৪৯ এর ১১ মার্চ নির্ধারিত হয়েছিল আন্দোলন দিবস হিসেবে। এখানেই রাজনৈতিক আদর্শ বিরোধ, মাতৃভাষা প্রেমবোধ আর জাতীয়তা সংকীর্ণচিন্তা ক্রমশ প্রকাশ পেল। যারা আন্দোলনে টিকে থাকার জন্য জোরজুলুম, নানাবিধ চক্রান্ত করেছিল তারা এমনি এমনি এই আন্দোলন থেকে পিছু পা হয়নি। তারা এই আন্দোলনে টিকতে না পেরে নিজেরাই বাধ্য হয়ে এক সময় সরে দাঁড়ায়। এই আন্দোলনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল পূর্বপরিকল্পিত নানা রকম পরিকল্পনা ও অস্ত্রসহ সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী। অপর দিকে পূর্ব বাংলার ছিল আন্দোলনে জয়ী হবার তীব্র বাসনা, দেশের প্রতি ভালবাসা, সকলের মধ্যে একতা এবং আত্মবিশ্বাস। এগুলো এই আন্দোলনে জয়ী হবার পথ দেখিয়েছে। যে পথের সূচনা করেছিলেন তৎকালীন বাংলার দামাল ছাত্র সমাজ। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি প্রত্যেককে।

ভাষা আন্দেলনের যে সূত্রপাত হয়ে ছিল তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই চূড়ান্ত বিস্ফোরণে আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল টগবগে ছাত্র সমাজ। যারা ভাষা আন্দোলন থেকে হার মানতে বা পিছু হাঁটতে জানতেন না। নিশ্চিত বিপদ জেনেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কোন বাঁধা তাদের প্রতিরোধ করতে পার নি। নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। সকলকে দেখিয়েছিলেন অভয়, আগলে রেখেছিলেন অন্যদের। আমি সহ বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই সেই আন্দোলন দেখার সৌভাগ্য হয়নি সত্যি, কিন্তু সেই আন্দোলনের শিক্ষাকাজে লাগাতে পারি আমি সহ আমরা সকলেই। যে শিক্ষা হবে আমাদের জন্য সত্যের এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের শিক্ষা। আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের সমাজে এখনও অনেক আন্দেলনের প্রয়োজন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে এ আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসার সংখ্যা খুব বেশি না। আন্দোলন দেখলে আমরা দূরে চলে যাই, কোন ঝামেলায় যেতে চাই না। শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করি, অন্য কারও কোন খবর নেই না।

ভাষা আন্দোলন মুক্তিকামী বাঙালির সবচেয়ে গৌরবের আর বিশাল ও ব্যাপক সংগ্রামের। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী দখলদার শাসকচক্র ও তৎকালীন সাড়ে চার কোটি পূর্ববাংলার ভাষা-সাহিত্য, জীবন-যাপন, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-রাজনীতি পাল্টে দেবার পরিকল্পনা মাফিক দাবার গুটির ন্যায় চাল চালতে চালতে সামনে এগুতে থাকে। পরিকল্পনা করে পাকিস্তানীরা মন্ত্রী, ঘোড়া ও প্রচুর সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চারিদিক থেকে আক্রমণ করলে আমাদের পূর্বপুরুষরা দিগবিদ্বিগ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পিছুপা হয় নি, মনোবল হারায়নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য ও নৌকা নিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করার দাবিতে। ভাষার প্রতি মনের মাঝে ছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ঠিক যেমন মায়ের প্রতি সন্তানের

যে রকম ভালবাসা থাকে। কিন্তু একসময় পাকিস্তানীদের দাবার চাল উল্টা দিকে মোড় নিয়ে পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়।

এ দেশের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সমন্বয়ে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার, ধর্ম-গোত্রের সকলে একই জাতিসত্ত্বা গড়ে তুলেছিল। এই একই জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে রয়েছে হাজার বছরের বিশাল লোকায়েত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাণ্ডার। এত ঐশ্বর্য বর্জন করে কোন জাতি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। এদেশের বাঙালিরাও তা কখনও করতে পারত না। বহিরাগত শাসকেরা তাই চিরকাল বাঙালিকে পদানত করে রাখার জন্য বাঙালিদের সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকর থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। তাদের এই চক্রান্তে সহায়তা করার জন্য তারা বাঙালিদের মধ্যে কিছু নিচু মনের মানুষকেও খুঁজে পেয়েছিল। যারা তাদের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। সেই প্রাচীনকালেই এই প্রচারণাকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেছিল এক কবির কলম। সেই কলম দিয়ে কবি অকুতোভয় নিয়ে লিখেছিলেন -

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় জানি।

আন্দোলন করে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের সহ সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির সম্পদ। একুশে ফেব্রুয়ারীকে বিশ্ব সংস্কৃতির সম্পদ হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর সহায়তায়। আমাদের মাতৃভাষা আদায়ের আন্দোলনের দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যে ঘটনা এবং ঘোষণা এখন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয়টি হয়নি। বাঙ্গালীজাতি হিসেবে ২১ প্রত্যেকের জীবনে আলোকবর্তিকাসরূপ। একুশের চেতনা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করেছে এবং চেতনা দিয়েছে। এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা, মানবতা, প্রগতী, শান্তি ও মান মর্যাদাকে সমুজ্জল রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে কখনও কখনও কেউ কেউ নিজ রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সংস্কৃতিকে ভুলে যাই। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোথাও কোথাও একতার বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে। নিজেরাই হয়ে যাই পরস্পরের বিরোধী, সহ্য করতে পারি না নিকটবর্তী আপনজনকে। একই পিতামাতার সন্তান হয়ে ভাই বোনের বিপক্ষে যে কোন ধরণের অপরাধমূলক কাজ করতেও পিছপা হই না। একজন আরেকজনের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করি, অন্যায়ভাবে অত্যাচার ও আন্দোলন করি। যে আন্দোলন আমাদের আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা প্রতি বছর জাতিগতভাবে ২১ ফেব্রুয়ারী নানাভাবে পালন করছি এবং তা পালন করা আমাদের দায়িত্ব। এই ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের জীবনের একটি অংশ, তাই একে আমরা চাইলেও আমাদের জীবন থেকে কখনও বাদ দিতে পারব না। এই চেতনা আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করে দেশের জন্য সমাজের জন্য উন্নয়নমূলক কিছু করার। তাৎক্ষণিকভাবে উন্নয়নমূলক কিছু করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি না। কিন্তু কখনও কখনও সে সিদ্ধান্তের গভীরতা না থাকার কারণে অল্পতেই তা হারিয়ে যায়। ভুলে যাই একতার কথা, আন্দোলনের কথা, আন্দোলিত রক্তের কথা। আমরা প্রত্যেকে যদি ব্যক্তিগতভাবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে সুচিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অবশ্যই বোধদয়ের উদয় হবে এবং সঠিক চেতনা ফিরে আসবে। সে চেতনাকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করে বহন করতে পারব অনেক দূর পর্যন্ত এবং সকলের জন্য নতুন একটি সূর্যোদয়ের উদয় হবে। যে সূর্যের আলোতে আলোকিত হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি দেশ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ও রক্তকে অবমূল্যায়নকে করতে পারি না, করতে দিতেও পারি না। ২১ ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের কথা স্মরণ করতে হবে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে। তখনই একুশের তাৎপর্য নিয়ে আমরা হতে পারব নতুন একজন ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার। যেখানে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে চলবে, কেউ কাউকে অবমূল্যায়ন করবে না। সেই নব চেতনা সকলের মাঝে বিরাজ করুক॥ ❑

বাংলাদেশ জেজুইট ফাদার/ব্রাদারদের পক্ষ থেকে আন্তরিক নিমন্ত্রণ

এসো-দেখো-থাকো

প্রিয় কাথলিক ছাত্রবন্ধুরা, তোমরা যারা এই বছর ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছ ও মাধ্যমিক(এস.এস.সি) পরীক্ষা লিখছ, এবং যিশু সংঘে (জেজুইট) ফাদার/ব্রাদার হতে আগ্রহী, তোমাদের জীবনাহ্বান উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার সহায়ক 'এসো-দেখো-থাকো ' এবং একটি বিশেষ ইংরেজি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে আগামী ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১০ মার্চের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই।

"যাও, সারাবিশ্বে খ্রিস্টপ্রেমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করো!"

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করো–

ফাদার সৃজন এস.জে.	০১৭৫০১২৯৯২৭
ফাদার ফ্রান্সিস দরেছ এস.জে.	০১৭৪১০১৯১৭৭
ফাদার প্রবাস রোজারিও এস.জে.	০১৭৩২৮৭৫৬৯০
ফাদার রোহিত মৃ এস.জে.	০১৯৩০০২৬৬৩৭
ব্রাদার জেফরী ফিনি এস.জে.	০১৩০২৫৪০১৬৮

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভাষাশহীদগণ

হিমেল রোজারিও

কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ। মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়।

বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাশ হয়। যা কার্যকর হয় ৮ মার্চ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে প্রথম প্রহরে সর্বপ্রথম রাষ্টপতি এবং তারপরে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এদিন শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। সর্বত্র ওড়ানো হয় শোকের কালো পতাকা। সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও বেতারে ভাষা দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্র ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। এ উপলক্ষে সারা দেশেই থাকে নানা আনুষ্ঠানিকতা।

ধীরাজ কুমার নাথ, 'বাংলাদেশীরাই অর্জন করল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামক প্রবন্ধে লিখেন, মাতৃভাষাকে সুরক্ষা এবং আরও উন্নত করে জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করার একটি উদ্যোগ হচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। গ্রন্থমেলার সঙ্গে মিশে আছে আমাদের প্রাণের স্পন্দন, মনের আকুতি এবং হৃদয়ের অভিব্যক্তি। এ মেলার মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উন্মেষ হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় একশজনের বেশি। তাদের মধ্যে পাঁচজন ভাষা শহীদের নাম আমাদের অন্তরে গেঁথে রয়েছে। সেই সাথে আরো তিনজন ভাষা শহীদের পরিচয় পাওয়া গেছে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যতে। বিভিন্ন পত্রিকায় তাদের বিষয়ে লিখেছেন অনেকেই। অনেকের লাশ পুলিশ গুম করে দিয়েছেন। তাদের সন্ধান আজও মেলেনি।

শফিউর রহমান : পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার হুগলীর কোন্নগর গ্রামে ভাষা শহীদ শফিউর রহমান ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে। কলকাতা গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগ হওয়ার পরে পিতার সাথে ঢাকায় এসে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ঢাকা হাইকোর্টে হিসাবরক্ষণ শাখায় চাকরি করবেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বদিনের পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে পুলিশের রাইফেলের গুলি শফিউরের পিঠে এসে লাগে। গুলিতে শফিউরের কলিজা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে ডা. এ্যালিনসন অপারেশন করেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষণের কারণে শফিউর সন্ধ্যা ৬টায় মারা যান।

কয়েকজন ছাত্র মিলে শফিউর লাশ তিনদিন ঢাকা মেডিক্যালের স্টেরিলাইজ ডিপার্টম্যান্টে লুকিয়ে রেখেছিল। ঢাকা হাইকোর্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাকারিক কামালউদ্দিন ঢাকার তৎকালীন এসডিও'র নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে লাশ বের করে আনেন। কারণ লাশ দেওয়া হলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটায় আজিমপুর কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার শফিউর রহমানকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে মৃত্যুবরণকৃত অন্যান্য পরিবারের পাশাপাশি তার স্ত্রী বেগম আকিলা খাতুনকে আজীবন ভাতা প্রদানের ঘোষণা দেয়।

আবদুস সালাম : ভাষা শহীদ আবদুস সালাম ফেনী জেলার দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে করিমুল্লা জুনিয়র হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি এবং আতাতুর্ক মডেল হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। লেখাপড়া বন্ধের পরে কলকাতা মেটিয়াবুরুজে কলকাতা বন্দরে কাজ শুরু করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকায় ফিরে এসে আজিমপুরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের 'পিয়ন' হিসেবে কাজ শুরু করেন। বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভে অংশ নেন। ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ এলোপাথাড়িভাবে গুলি চালালে অন্যদের সাথে আব্দুস সালামও গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এই ভাষাশহীদ সালামকে বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম যুদ্ধ জাহাজ 'বি এন এস সালাম' নামে নামকরণ, ফেনী স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে 'ভাষা শহীদ সালাম স্টেডিয়ামে নামকরণ, দাগনভূঁইয়া উপজেলা মিলনায়তনকে 'ভাষা শহীদ সালাম মিলনায়তন নামকরণ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভাষাশহীদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মণপুর গ্রামের নাম

পরিবর্তন করে 'সালাম নগর', নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্র হল প্রতিষ্ঠা 'ভাষাশহীদ আবদুস সালাম নামে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভাষা শহীদ সালাম মেমোরিয়াল কলেজ'।

আবুল বরকত : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাষা শহীদ আবুল বরকত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহাকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এর পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করে এবং এবং একই বিষয়ে এমএ শেষ পর্বে ভর্তি হন। বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হন আবুল বরকত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন। রাত ১০টার দিকে আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ জুলাই বরকতের বাবা শামসুজ্জোহা ভারতে মারা যাওয়ার পরের বছর মা হাসিনা বানু ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আংশিক সম্পত্তি বিনিময় করে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন আজিমপুরের কবরস্থানে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেকে বছরে একদিন একটু আদর করার জন্য। শহীদ আবুল বরকতকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরনোত্তর একুশে পদক প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালাটি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে উন্মুক্ত করা হয়। তার জীবনী নিয়ে বায়ান্নর মিছিল নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন বরকতের মা হাসিনা বানু।

আব্দুল জব্বার: ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার। তিনি ধোপাঘাট কৃষিবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেন। আর্থিক দৈনতার কারণে লেখাপড়া বাদ দিয়ে পিতাকে কৃষিকাজে সাহায্যে করেন। ভালো কাজের আশায় নারায়নগঞ্জে যাওয়ার পরে এক ইংরেজের সাথে পরিচিত হয়ে বার্মায় (মায়ানমারে) ১২ বছর চাকরি করেন। দেশে ফেরার পর পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডে (পিএনজি) যোগদান করেন। পিএনজি ভেঙ্গে দেওয়া হলে পরবর্তীকালে তিনি আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন। ময়মনসিংহ থেকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজ গ্রামে 'আনসার কমান্ডার' হিসেবে কাজ করেন। এরই মধ্যে বিয়ে করে এক ছেলের বাবা হন জব্বার।

শ্বাশুড়িকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। হাসপাতালে তার শাশুড়িকে সেবা প্রদানের সময় ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল মিছিলটি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে আসলে জব্বার তাতে যোগদান করেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং জব্বার গুলিবিদ্ধ হন। ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে যারা হাসপাতালে নিয়ে যান, তাদের মধ্যে ছিলেন ২০/৯ নম্বর কক্ষের সিরাজুল হক। শহীদ আব্দুল জব্বারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মরনোত্তর একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। মহান ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

রফিক উদ্দীন আহমদ: রফিক উদ্দীন আহমদ মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের পারিল গ্রামে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় বায়রা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, পরে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজ এবং পরবর্তীতে জগন্নাথ কলেজে (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ করে। রফিক ভাষা আন্দোলনের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন এবং সক্রিয় একজন আন্দোলনকারী হিসেবে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গণে আসলে পুলিশ গুলি চালায়, এতে রফিকউদ্দিন মাথায় গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে তাদের মাঝে ডা. মশাররফুর রহমান খান রফিকের গুলিতে ছিটকে পড়া মগজ হাতে করে নিয়ে যান। রাত ৩টায় সামরিক বাহিনীর পাহারায় ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। রফিকের আত্মত্যাগের জন্য ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাকে মরনোত্তর একুশে পদক প্রদান করে। তার গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রফিকনগর করা হয় এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে গ্রামে তার নামে 'ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে প্রাতিষ্ঠানিক ভবন নামকরণ করা হয়। তার স্মৃতির স্মরণে 'চাঁদের মত চন্দ্রবিন্দু' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশে তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ভাষা শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর বাদেও আরো বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকার, স্মৃতিচারণ, সংবাদ পত্রিকায় প্রকশিত সংবাদ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিকরে তিনজন ভাষাশহীদের নাম ও পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উপেক্ষিত সেই তিন ভাষা শহীদদের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

অহিউল্লাহ: অহিউল্লাহ ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি সেনা মোতায়েন করে। নবাবপুর রোড দিয়ে জনতার ঢল দেখে কৌতূহলবশত তা দেখতে এসেছিলেন অহিউল্লাহ। ঘটনার সময় অহিউল্লাহ মনের আনন্দে নবাবপুর রোডের পাশে 'খোশমহল' রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ চিবুচ্ছিলেন। এমন সময় একটি গুলি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়। গুলিতে মারা যাওয়ার পর পুলিশ অহিউল্লাহর লাশ গুম করে ফেলে। ২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদে তার মৃত্যুর খবর ছাপানো হয়। তাকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

আবদুল আওয়াল: ২৬ বছর বয়সী আবদুল আওয়াল পেশায় ছিলেন একজন রিকশাচালক। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে একুশের ভাষাশহীদদের গায়েবানা জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন রিকশাচালক আবদুল আওয়াল। জানাজা শেষে বিশাল শোক মিছিলেও অংশ নেন তিনি। মিছিলটি যখন কার্জন হলের সামনের রাস্তা অতিক্রম করছিল, তখন অতর্কিতে একটি মিলিটারির ট্রাক মিছিলের এক পাশে উঠিয়ে দেয়া হয়। ট্রাকের আঘাতে সরকারি নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আওয়াল। সরকারি প্রেস নোটে অবশ্য বলা হয়েছিল, এটা নেহায়েত একটা সড়ক দুর্ঘটনা মাত্র। আওয়ালের বসিরন নামে তার ৬ বছরের একটি কন্যাসন্তানও ছিল। মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি কন্যা ওই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সিরাজুদ্দিন : সিরাজুদ্দিন নবাবপুরে 'নিশাত' সিনেমা হলের বিপরীত দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় টহলরত ইপিআর জওয়ানের গুলিতে মারা যান। সিরাজুদ্দিন ওরফে নান্না মিয়া ছিলেন সিরাজুদ্দিনের মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষকারী একমাত্র সাক্ষী। তার সাক্ষ্যে জানা যায়, সিরাজুদ্দিন থাকতেন

তাঁতিবাজারের বাসাবাড়ি লেনে। ভাষাসৈনিক ও গবেষক আহমদ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি বাবুবাজার থেকেই চলমান মিছিলে অংশ নিয়ে সদরঘাটে রাস্তার মোড়ে পৌছান। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া বাহাদুর শাহ পার্ক হয়ে রথখোলায় পৌছাতেই দেখেন চকচকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে। তা সত্ত্বেও মিছিল স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে এগিয়ে চলে। সেরাজুদ্দিন মিছিলে চলতে চলতে দেখতে পান উল্টো দিক থেকে সৈন্য বোঝাই একটি ট্রাক 'চৌধুরী সাইকেল মার্ট, বরাবর এসে থেমে যায়। এদিকে 'মানসী' সিনেমা হলের গলি থেকে পুলিশ ও জওয়ানদের একটি অংশ গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। তখনি ট্রাক থেকে গুলি ছুটে আসে মিছিল লক্ষ্য করে।

এই ভাষা শহীদেরাই ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা। যাদের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রাণের বাংলা ভাষা। এই ভাষাশহীদের স্মরণ করতেই মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এই গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বের হয়ে আসছে নবীন লেখক। সেই সাথে কেউ হচ্ছে প্রবীণ, কেউ বা বুদ্ধিজীবি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত বাংলা ভাষাকে বিকৃত না করা।

তথ্যসূত্র : দৈনিক সংবাদ, হাসান মাহামুদ; রাইজিং বিডি.কম, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ॥❑

ভুল সংশোধনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সংখ্যা - ৬ এর ১০ পৃষ্ঠার ১ম কলামের প্রথম থেকে তৃতীয় লাইনে 'সিএসসি'র' পরে 'মৃত্যুবার্ষিকী পালন' পড়তে হবে। তারপর ২য় কলামের ৩য় প্যারার তৃতীয় লাইনে 'আনাশোনা' এর স্থলে 'জানাশোনা' পড়তে হবে। পরিশেষে ১১ পৃষ্ঠার ১ম কলামের শেষের চতুর্থ লাইনের 'না' শব্দটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ভুলের জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৫২ এর স্মৃতিচারণ

রোমান মারচেল্লো বাড়ৈ

স্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো ডেকেই চলেছে,
শোনা যাচ্ছে ঐ অদূর আঙিনার ঝোঁপঝাড়ে।
এদিকে ছোট্ট বালকটি নগ্ন পায়ে
শিশির ভেজা ঘাস পেরিয়ে,
বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে গুনে গুনে
৪টি গোলাপের মৃত্যু ঘটালো।
এ যেন মাতৃকোল থেকে সন্তান ছেদন।
যেমনটি ঘটেছিল সেই ভাষা আন্দোলনে।
বুলেটের আঘাতে, শহীদের বুক ক্ষত বিক্ষত।
টিয়ারের নিশানা থেকে রক্ষা পেল না কেউ,
খালি হলো প্রতিটি মায়ের কোল।
৪টি গোলাপ নিয়ে বালকটি উপনিত হলো পিতার কবরে,
যেখানে চির নিদ্রায় নিদ্রিত তার পিতা।
প্রভাত ফেরিতে বিধবা মায়ের আঁচল ধরে
নগ্ন পায়ে হেঁটে চলেছে, রাজপথে।
এই তো সেই রাজপথ....
যেখানে পড়েছিল পিতার রক্তাক্ত নিথর দেহটি।
আজ সেই রাজপথ ফুলে ফুলে সজ্জিত আলপনায় মুখরিত।
কিন্তু ৫২তে অঙ্কিত হয়েছিল
শহীদদের ছোপ ছোপ রক্তের আলপনা।
বিভীষিকাময় দিনের স্মৃতিচারণে
ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক।
আজ সেই স্মৃতিচারণেরই মাস
সকাল শহীদের আত্মা চিরশান্তি পাক।

তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম

প্রয়াত সিস্টার আসুন্তা রোজারিও সিআইসি

জন্ম: ২৩/০২/১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম ব্রত গ্রহণ: ০৮/১২/১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৪/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জন্ম নিলে মরতে হবে সৃষ্টির এই অমোঘ নিয়ম অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই এই নিয়মে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সকলকে ছেড়ে পরম পিতার কাছে চলে গেছ। তোমার এই মৃত্যুতে আমরা হারিয়েছি একজন পরম হিতৈষী বন্ধুকে। তুমি ছিলে একজন আধ্যাত্মিক মানুষ ও আমাদের পরিবারের সকলের আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা। সবসময় আমাদের সকল কাজে সুপরামর্শ দিতে ও পরিচালনা করতে। তোমার অভাব আমরা অনুভব করবো প্রতিটি ক্ষণে ও আমাদের প্রতিটি কাজে।

তুমি আমাদের পরিবারের প্রথম সিস্টার, এমনকি বোর্ণী ধর্মপল্লীরও প্রথম সিস্টার। তাছাড়া তুমি শান্তিরাণী সম্প্রদায়ের ২য় ব্যাচের সিস্টার ছিলে। তাই তুমি ছিলে অনেকের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয়। তুমি সবসময় মানুষকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতে। তোমার পরামর্শে অনেকে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছে। তাইতো তুমি ছিলে সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

তোমার ভালবাসার কথা আমরা কখনও ভুলবো না। আমরা বিশ্বাস করি তুমি যে অপার স্নেহ-ভালবাসা প্রতিটি মানুষের প্রতি দিয়েছ, ঈশ্বর তার পুরস্কার হিসেবে তোমাকে তাঁর কোলে স্থান দিয়েছেন। প্রভুর সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমার আদর্শ অনুযায়ী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে পারি। তুমি রবে আমাদের সকলের হৃদয়ে নীরবে নিভৃতে, শক্তি যোগাবে সকল কাজে-কর্মে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

ভাইস্তা ও ভাইস্তা বউ : গাব্রিয়েল রোজারিও ও সরলা পেরেরা
নাতি ও নাতি বউ : শিশির ও রিনি, প্রণয় ও তাপসী
নাতনি ও নাতনি জামাই : সিস্টার সীমা রোজারিও, সিআইসি, প্রণতি ও বাঁধন
পুতি ও পুতিন : প্রতিজ্ঞা, রিমঝিম, পরাগ, প্রকৃতি, প্রযুক্তি, পরমা ও সকল আত্মীয়-স্বজন

বিপ ৫৩/২০

বই এবং বইমেলা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

বই একালে আমাদের খুব প্রিয়সঙ্গী। বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা। পড়ার সময় আনন্দ পাওয়া। অবসরের বিনোদনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বইয়ের ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। আজ থেকে পাঁচ-ছয়'শ বছর (১৪৪০-৫০) আগে জার্মানিতে যখন জোহানেস গুটেনবার্গ স্থানান্তরযোগ্য টাইপ বা অক্ষর উদ্ভাবন করলেন, তখন থেকেই শুরু হলো বইয়ের অস্তিত্ব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জার্মানির এই অবদান বিশ্বের জ্ঞানজগতের বিশাল বিস্তার ঘটিয়েছে। জ্ঞানচর্চা ও তার অনুশীলন সহজলভ্য হওয়ায় সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশেরও সূচনা ঘটল মুদ্রিত বইয়ের কল্যাণে।

বইমেলার ইতিহাস অনুসন্ধান করলেও দেখা যায়, এর ইতিহাসও বইমুদ্রণের ইতিহাসেরই প্রায় সমকালীন। ইউরোপে বইকে দেখা হয়েছে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পণ্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে। সে কারণেই এর প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টির জন্য ওই সব দেশে বইয়ের পসরা সাজিয়ে বই-বিক্রেতারা বসেছে নানা জায়গায়। বই বিকিকিনির এই আয়োজনকেই একালে চিহ্নিত করা হয়েছে বইমেলা হিসেবে। বইমেলা এখন গোটা বিশ্বের এক জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞানানুশীলনের কেন্দ্রও বটে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে একদিকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় ব্রিটিশ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় যেমন, আধুনিক মুদ্রিত বইয়ের সূচনা তেমনি পাশাপাশি বটতলার বইয়ের বিশাল বিস্তারের কথাও আমাদের জানা। পৃথিবীতে এখন পঞ্চাশটির মতো আন্তর্জাতিক বইমেলা হয়। বাংলা একাডেমির বইমেলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে।

অমর একুশে বইমেলা সূচনা হয় স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী। মুক্তধারা প্রকাশনীর কর্ণধার চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণের বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে গোড়াপত্তন করেন এই বইমেলার। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাই বইমেলা চালিয়ে যান চিত্তরঞ্জন সাহা। তাঁর দেখাদেখি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অন্যরা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমিকে মেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। চিত্তরঞ্জন সাহা এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মনজুরে মওলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন শুরু করেন। এর পরের বছর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের 'অমর একুশে বইমেলা'র অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ অব্দি বইমেলা হতো কেবল বাংলা একাডেমিতেই। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অমর একুশে বইমেলা এখন হয়ে ওঠেছে বাঙালির প্রাণের মেলা।

ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়েছে। চলছে অমর একুশের বইমেলা। তাই বই বই গন্ধও চারিদিকে। বাংলা একাডেমির বইমেলাটি বইপাঠকের কাছে প্রাণের মেলা, মিলন মেলা হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের মানুষের গভীর আবেগ, ভালোবাসা ও গ্রন্থপ্রীতি যুক্ত হয়ে মেলাটি ধীরে-ধীরে বাঙালির সাংস্কৃতিক জাগরণ আর রুচি নির্মাণের এক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। প্রতি বছর সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা বিপুল হারে এই মেলায় আসেন, বই কেনেন, বন্ধুর সান্নিধ্যে আড্ডা দেন এবং জীবনের নানা বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে থাকেন। বাঙালির উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনন্য প্রতীক বাংলা একাডেমির বইমেলা। মানবিক চৈতন্য, শুভবুদ্ধি ও একটি আলোকিত সমাজ গঠনই এই মেলার লক্ষ্য। বই আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী কিন্তু বর্তমান সময়ে ফেব্রুয়ারি মাস চলে গেলে বই জিনিসটা আমাদের কাছে গরমের দিনের কম্বলের মতো পরিত্যাজ এবং তোরঙ্গে তুলে রাখার বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বই তো অতিথি পাখি নয়, মৌসুমি ফুল নয়। বই প্রতিদিনের বিষয়; সারা বছরের সঙ্গী। তাই তো বলা যায়, বইমেলা অনিঃশেষ, রয়ে যাবে তার রেশ।

বই পড়ে কী হয়? যারা বই পড়েন বা বই পড়তে পছন্দ করেন। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হননি এমন কাউকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ যাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই তাদের এই ধরনের প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। এবার আসা যাক এই প্রশ্নের উত্তরে কী বলা যেতে পারে। বইপড়ুয়ারাই জানেন আসলে তাতে কী হয়। ভালো একটি বই পড়া যেন প্রিয়জনের সান্নিধ্যের মধুর অনুভূতি। কখনও কখনও সেই অনুভূতিতে চারপাশ কেমন অপার্থিব হয়ে ওঠে। মনটা ভরে যায় অলৌকিক আলোয়। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, "বইপড়া মানুষ চিন্তা করে একটির বদলে একাধিক মাথা দিয়ে। একেকটি বই একেকটি বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক।" তাই যত বই, তত মাথা। কিন্তু বই কি কেবলই পড়ার? এখানেও সে প্রিয়জনেরই মতো। বই কিনে পড়ার পরে তা বাড়ির আলমারি অথবা শেলফে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংগ্রহশালা থেকে পছন্দের বইটি নিয়ে তার গায়ে হাত বোলানো কিংবা পাতার ভাঁজে নাক ডুবিয়ে বুক ভরে মিষ্টি গন্ধ নেওয়া। কয়েকটি দিন বইটা নিজের শয্যায় পাশে পাশে রাখা। তারপর ধীরে-ধীরে আবার শেলফের তাকে উঠিয়ে রাখা। এভাবেই আমরা আবিষ্কার করি বই হয়ে ওঠেছে প্রিয়জনের মতো।

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের যুগে ই-বুকের আবির্ভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কাগজের বই কি থাকবে! এ নিয়ে নানান মতামত তৈরি হয়েছে। কেউ এর সঠিক জবাব দিতে পারেনি। হয়তো উত্তরটা সময়ই বলে দেবে! সে যাই হোক। একজন মানুষ মগ্ন হয়ে বই পড়ছেন; এর চেয়ে অনুপম দৃশ্য কি আর কিছু হতে পারে! ইন্টারনেট আমাদের চটজলদি তথ্য দিতে পারে সত্য, কিন্তু গভীরতর জ্ঞান নয়। ইন্টারনেটে যে তথ্যটি আমার দরকার, কম্পিউটারের একটি ক্লিকে দ্রুততম সময়ে আমি সেটি পেয়ে যেতে পারি। অন্য কথায়, আমি যা পেতে চাই, ইন্টারনেট আমাকে তা-ই দেয় কিন্তু বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আছে চমক, যা আমি খুঁজিনি না ভেবেও দেখিনি। কিন্তু চারপাশের পৃথিবীকে বোঝার জন্য জরুরি, বই আমাকে দেয় তা-ই। বই পড়া মানে শুধু তথ্য পাওয়া নয়, অনেক তথ্যের বিন্যাসে একটি তর্ক বা বোঝাপড়ার সূচনা, একটি ভাবনা জগতের মধ্যে অভিজ্ঞতা ভরা সফর। বই পড়ার আগের আমি আর পরের আমি তাই আলাদা দু'জন মানুষ। আগের মানুষটির চেয়ে পরের মানুষটি পৃথিবীকে বুঝতে পারেন আরও অর্থপূর্ণভাবে। আমরা একটা ইলেকট্রনিক বই পেলে খুশি হই না, কিন্তু একটা কাগজের বই যেটা ছাপার অক্ষরে লেখা, কাগজে বাঁধাই করা; সে এক অপূর্ব গন্ধ, সেটা হাতে পেলে খুশি হই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

** সম্পাদক, প্রথম আলো, শিল্পসাহিত্য, শামসুজ্জামান খান (বই এবং বইমেলা কিছু ইতিহাস ও প্রত্যাশা), পাতা-১ শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি ২০১৬।*

** সাজ্জাদ শরিফ: বই পড়া, ছুটির দিনে, দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।* ❑

একুশ অধিকার আদায়ের চেতনা

নোয়েল গমেজ

একুশের চেতনা এবং ভাষা বিকৃতি প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে একুশের চেতনা কাকে বলে। প্রশ্ন ওঠে ভাষার বিকৃতি কাকে বলে। একুশের চেতনা বলতে আমি একটি জিনিস বুঝি সেটি হল-আমার যা অধিকার, আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য আমি সেটা পাব। যদি না পাই তাহলে আমি প্রতিবাদ করব এবং আমি চেষ্টা করব, যাতে এ অধিকার আমি পেতে পারি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন হয়েছিল- মানুষ কেন আন্দোলন করল? উর্দুকে যদি বাংলা ভাষার সঙ্গে একসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা করা হতো তাহলে এ আন্দোলনটি হয়তো হতো না। পরে এক সময় পাকিস্তানে উর্দু এবং বাংলা দুটিকেই রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধি-আমার ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে না এটা তো হতে পারে না। আমি আমার অধিকারকে সমুন্নত করতে চেয়েছিলাম। আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য আমি সেটি পেতে চেয়েছিলাম। এখন প্রশ্ন ওঠে আজও কি আমি আমার অধিকার সম্পূর্ণ পাই? আজও কি আমার যা প্রাপ্য তা-কি আমি ন্যায্যভাবে পাই? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়-তাহলে বলতে পারি আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আর যদি এসব প্রশ্নের উত্তর 'না' হয় তাহলে ভাবতে হবে কিভাবে অগ্রসর হলে আমাদের ন্যায্য অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারব এবং কেউ আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

এখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হল-ভাষার বিকৃতি। ভাষার কোনো বিকৃতি হয় এটা আমি বিশ্বাস করি না। তার কারণ হল ভাষা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। এ পরিবর্তনের অর্থ বিকৃতি নয়। আজ থেকে একশ' বছর আগে যে ভাষা বাংলা বলে ব্যবহৃত হতো আজকের বাংলা ভাষা তেমনটি নয়। তার মানে কি বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটেছে-না, ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিবর্তনকে মেনে নিতে হবে। যদি পরিবর্তন মেনে নিই তাহলে বিকৃতি কী-এ প্রশ্নটি জটিল। কারণ বিকৃতি তখনই হতে পারে যখন একটি প্রমিত ভাষা থাকে-সেই প্রমিত ভাষা থেকে সরে গেলে তাকে বিকৃতি বলা চলে। কিন্তু প্রমিত ভাষা বলেই তো কিছু নেই, থাকতে পারে না। সুতরাং ভাষার বিকৃতি বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ভাষা পাল্টাচ্ছে, পাল্টাতেই হবে-তার কারণ হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানুষ পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে, মানুষের জীবন পাল্টাচ্ছে, মানুষের আবহ পাল্টাচ্ছে, মানুষের চেতনা পাল্টাচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ভাষাকেও পরিবর্তিত হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি বলে যে, ভাষা আগের মতো নেই এটা বিকৃতি হয়ে গেল সেটা মেনে নেয়া যায় না।

কিন্তু একটি বিষয় আমাদের স্বীকার করতেই হবে-আমরা কি আমাদের ভাষার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান? বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের যতটা মনোযোগ দেয়ার কথা ছিল আমরা কি সেটা দিয়েছি? আমরা যে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন করেছি, আমাদের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, সেই অধিকার কি আমরা নিজেরাই ক্ষুণ্ন করিনি? ভেবে দেখুন এখনও আমাদের দেশের বহু আইন বাংলা ভাষায় লিখিত হয়নি এবং আইন হল রাষ্ট্রের, সরকারের ভিত্তি। আইন ছাড়া সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র চলে না, আইন ছাড়া সংবিধান ছাড়া দেশ চলে না; সরকার চলে না। সেই আইনই যদি আমরা ঠিকমতো বাংলা ভাষায় লিখতে না পারি সেটা আমাদের জন্য গৌরবের নয়। আমি তো মনে করি, এখন সময় এসেছে আর দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন করে সব আইনকে বাংলা ভাষায় লেখা। নতুন করে লেখা মানে এই না যে, আইন পরিবর্তন করতে হবে বরং যে আইনটি ইংরেজিতে আছে সেটিকেই বাংলা করতে হবে। যদি বাংলা করার সময় মনে হয় কালের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এর কিছু পরিবর্তন করতে হবে, সেটি করতে হবে। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এখন কথা হচ্ছে যে, আমরা যখন সংবিধানে কথা বলছি তখন সংবিধানের দুটি ভাষ্য আছে-মূল ভাষ্যটি বাংলা তার সঙ্গে একটি ইংরেজি ভাষ্যও আছে। তার মানেটা এই দাঁড়ায়, আমি যদি বাংলা ভাষার যে সংবিধান আছে সেটি বুঝতে না পারি বা তা নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, কোনো সংশয় দেখা দেয় তাহলে আমি ইংরেজি ভাষায় কী লেখা আছে সেটি দেখে এটি বোঝার চেষ্টা করব। এটি আমার কাছে জটিল মনে হয়। বরং আমাদের উচিত যে, বাংলা ভাষায় যা আছে সেটিকে প্রাধান্য দিয়েই উদ্ভূত সংশয় দূর করতে চেষ্টা করা।

আরেকটি বিষয় বলার আছে সেটি হল-পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। প্রযুক্তি পাল্টে যাচ্ছে এবং বাংলা ভাষাকে আমাদের এ প্রযুক্তির সঙ্গে একই মনের করে গড়ে তুলতে হবে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষাকে কতটুকু সফল ও সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারি-সেদিকে আমাদের মনোযোগ এবং গুরুত্ব দিতে হবে॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মনজুরে মওলা, যুগান্তর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ভস্ম কথা

মাস্টার সুবল

আমি একসময় একটানা ৫ বছর নারিন্দা সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ৩য় বর্ষের ছাত্রদের ধর্মক্লাসে শিক্ষা দিয়েছি। ধর্মক্লাসে ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পেয়েছি। প্রশ্নগুলোর উত্তর সর্বদা বাইবেলকে অনুকরণ করেই দিয়েছি। তবে ভস্ম সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরটা আমার কাছে যত সহজ ছিল, তা ছাত্রদের বুঝানো তত সহজ ছিল না। ক্লাসে একটি ছোট ছাত্র আমার কাছে প্রশ্ন রাখে, স্যার, ঈশ্বর মাটি থেকে ধূলো নিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তিতে আদমকে সৃষ্টি করলেন, তবে কেন স্যার, বুধবার কে ধূলো বুধবার না বলে ভস্ম বুধবার বলা হয়, আবার ফাদার ভস্ম বুধবারে আমাদের কপালে ধূলোর পরিবর্তে ভস্ম বা ছাই মেখে বলেন, তুমি ধূলো আর ধূলোতেই ফিরে যাবে। এটা কি ঠিক স্যার? ধূলো পাওয়া যায় মাটি থেকে আর ভস্ম বা ছাই পাওয়া যায় গাছ লতাপাতা আগুনে পুড়িয়ে, তাই না স্যার?

আমি এ প্রশ্নের উত্তরটা ছাত্রকে পদার্থবিদ্যা অনুকরণে বলি, মানুষ একটি পদার্থ। মানুষের মৃত্যুর পর তাকে কবর দেয়া হলে তার দেহ মাটিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে জীবজন্তু, গাছ লতাপাতা মাটিতে পুতে রাখলে মাটিতে পরিণত হয়। আবার আগুনে পোড়ালে ভস্ম বা ছাইয়ে পরিণত হয়। ঐ ভস্ম বা ছাই হলো মাটি। মাটি, ধূলো বা ছাই একই বস্তু। তবে জানতে হবে, বুঝতে হবে, মাটির ধূলো অথবা ভস্ম বা ছাই কপালে লেপন করা কোনটা ভাল। আবার ভস্ম বা ছাই ধূলোর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রোগজীবাণু মুক্ত, আর কপালে লেপন করাও সহজ। শেষে বললাম, এ বিষয়ে একজন ফাদার আরো ভাল উত্তর দিতে পারবেন।

মূলশিক্ষা : সুতরাং ছোট বন্ধুরা আমরা তাহলে আজকে নতুন কিছু শিখলাম। সামনেই কিন্তু ভস্ম বুধবার। তাই তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা বাড়িতে বড়দের কথা শুনবে ও তাদের মান্য করবে॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছ!

নর্ভিনা অর্লিন গমেজ
সেন্ট তেরেজা স্কুল
৩য় শ্রেণি

রক্তের মাঝে বইছে আমার বর্ণমালা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

তোমার বুক চিঁড়ে যে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে
তারই উর্বরতায় মাটিতে ফুটে শত ফুলদল
পাখপাখালী উড়ে বেড়ায় ফুলের সৌরভ মেখে
ওরাও গান গায় বাংলার, হয়ে ওঠে উচ্ছল॥

সূর্যের কিরণ নেচে বেড়ায় উঠুন জুড়ে
শ্রাবণের বৃষ্টি ছুঁয়ে যায় রক্তমাখা ভূমি
বাউলের একতারা গান বাঁধে বাংলায়
ভালোবেসে যে বর্ণমালা গেঁথেছ তুমি॥

ঘুম পাড়ানী গান গায় মা পরম মমতায়
ঘুমভাঙ্গা চোখে দেখি প্রথম মায়ের মুখ
আদরমাখা বুলি ছড়িয়ে থাকে চারিদিকে
মা বলে ডাকি বারবার, ঝরে অনাবিল সুখ॥

তারায় তারায় সেজে থাকে গোধূলি বেলা
সব রঙ নিয়ে তখনও শিশু খেলা করে নির্ভয়ে
প্রাণ খুলে গায় বাংলায়, সাঁঝের যত গান
ওরা বাঁচে সুখে, বড় হয় বর্ণের বলয়ে॥

বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছ যেই মধুর বুলি
পাতা ঝরার শব্দেও বাজে সেই সুর
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
ছড়িয়ে যায় সেই ধ্বনি, দূর থেকে বহুদূর॥

দক্ষিণের বাতাস বয়ে যায় শনশন ছড়িয়ে মাঠ প্রান্তর
রাখালি ছেলে বাঁশিতে সুর তুলে, কি যে সুমধুর
বৃষ্টিমাখা ভেজা মাটির গন্ধ দু'পায়ে জড়িয়ে
বর্ণমেলায় নেচে বেড়ায় খুকি, নুপুরে তোলে সুর॥

রক্তের মধ্যে মিশে আছে আমার সাধের বর্ণমালা
ওরা বাংলায় হাসে-কাঁদে, সাজায় কবিতার অক্ষর
ওরা জেগে থাকে ছেলেহারানো মায়ের কোলে
আগুন মশাল জ্বেলে সোচ্চার অন্যায়ের বিরুদ্ধে
করে অনশন রাতভর॥

কি দিয়ে আর করি প্রকাশ বর্ণমালার সুখ
যে সুখে লুকিয়ে আছে জীবন দানের প্রীতি
আমি তাদের দানে বাঁচি, বাংলাকে ভালোবাসি
লিখি তাদের কথায়-সুরে জীবনের জয়গীতি॥

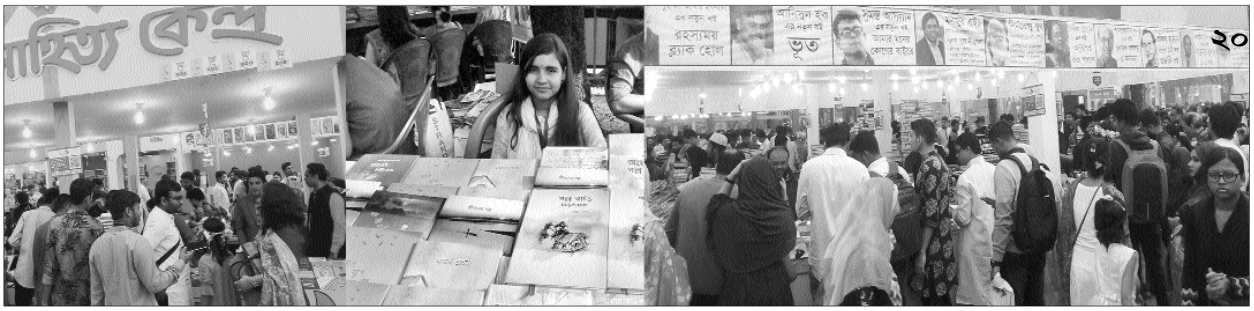

প্রাণের মেলা, বই মেলা বই পড়ার ভাবনা

জ্যাষ্টিন গোমেজ ও জাসিন্তা আরেং : ফেব্রুয়ারি মাস, একদিকে ভাষার মাস অন্যদিকে বাঙালির প্রাণের মেলা বই মেলা শুরু হয়। রক্তস্নাত একুশের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছিলাম বাংলায় কথা বলা ও লেখার অধিকার। মাতৃভাষার চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে শুরু হয় বাঙালির প্রাণের উৎসব অমর একুশে গ্রন্থমেলা। আর তাই তো বইকে ঘিরে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের মাসব্যাপী মিলনমেলা বসে বাংলা একাডেমি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশে হাজারো মেলার মাঝে এই বইমেলার গুরুত্ব ও আবেদন সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালির সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে মূলত এ মেলাকে কেন্দ্র করে। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিবোধ ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এই গ্রন্থমেলার শুরুর আগে থেকেই তাই আপামর বাঙালির প্রাণে ধ্বনিত হয় 'লেখক-পাঠক-প্রকাশক'-এর মিলিত হওয়ার সুর। মেলা শুরু হলে সেই সুরে জমে ওঠে আড্ডা। চলে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত। বছর ঘুরে আবারও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বইপ্রেমিদের আড্ডায় আর লেখক-প্রকাশকদের মাঝে সেই সুরের অনুরণন; আর সেই সুরের অনুরণনই প্রকাশ পেয়েছে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ প্রতিবেদনে।

এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় **ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি'র** দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বই দু'টি হলো: ১। স্বপ্নযাত্রা ২। ছড়ায় ছবি, ছন্দে-আনন্দে। লেখক ব্রাদার নির্মল সিএসসি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, একজন নবীন লেখক হিসেবে আমার অনুভূতি ভিন্ন রকম একুশের বই মেলা বাঙালির প্রাণের মেলা, যারা মেলায় আসেন, যারা বই ও মেলা ভালোবেসে ফেলেছেন, যারা লেখক, পাঠক, দর্শক তারা কেউ এই মেলায় একবারের মত হলেও ঘুরে যেতে না পারলে সারাবছর আফসোস করেন। মেলার আয়োজন, পরিসর ও পরিবেশন চমৎকার, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ খালি হাতে বের হয়ে আসেন না। বই পড়া শুধু খ্রিস্টান সমাজ কেন, যেকোন মানুষের জন্যই অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বই পড়ার উদ্দেশ্য কেবল জানা, জ্ঞানাহরণ করা, শিক্ষিত-পণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি নয়। পড়ার মধ্য দিয়ে চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, আচরণে নতুন অন্তরানুভূতির ভাবধারা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে অদৃশ্য স্পন্দন বা কম্পন সৃষ্টি করে। এছাড়াও জীবনধারায় তা সঞ্চালিত হয় যা উন্নত মানুষের সাক্ষ্য ও বার্তা বহন করে। পড়ুয়া আর না পড়ুয়ার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আমাদের ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে অনেক মানসম্মত ও সৃজনশীল লেখক রয়েছে, পাঠকও রয়েছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। সাপ্তাহিক "প্রতিবেশী" সহ আমাদের অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলো তিলে-তিলে লেখক ও পাঠক তৈরি করে দেয়। নিজেদের পরিমণ্ডলে লেখা, প্রকাশ ও পড়ার পাশাপাশি বাইরে জ্ঞানের ও সংস্কৃতির বড় জগতটাতে বিচরণের সুযোগ অনেক বড়। সেখানে যত বেশি প্রবেশ করা যায়, ক্ষুদ্র সমাজ এবং নিজে ততই বেশি শক্তিশালী ও উপকৃত হবে।

ছাত্রজীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখির পথচলা শুরু। একজন নবীন লেখক হিসেবে আমার রয়েছে ভিন্ন রকম অনুভূতি। প্রতিটি লেখা আমার কাছে নিজের এক একটি সন্তানের মত। আর প্রকাশিত বই সেই অনুভূতিকে আরো বেশি গভীরতর করেছে। কোন পাঠক বই কেনার উদ্দেশে স্টলে এসে যখন আমার বইটি নেড়ে-চেড়ে দেখেন; তারা যেন আমার গায়েই হাত বুলাচ্ছে এমনই অনুভূতি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এছাড়াও নবীন লেখক ব্রাদার নির্মল গমেজের মা **সবিতা আগ্নেশ কস্তা** বইমেলাতে এসে তার আনন্দের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এবারের বই মেলা আমার কাছে খুব ভাল লাগছে। ভাল লাগার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো আমার ছেলে, ব্রাদার নির্মল গমেজ এবারের বই মেলাতে তার বই প্রকাশ করেছে। আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই অনেক কষ্ট করত। তারা অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে। আর তাই তো তারা আজ ভাল ফল ভোগ করছে। আমার যে কত ভাল লাগছে ছেলে বই এর মোড়ক উন্মোচন এ থাকতে পেরে তা বলে বোঝানো যাবে না। কত মানুষ যে এসেছে তার এই বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে!

অনুভূতি দিয়ে পড়তে হবে
বার্ণাবাস সুবীর কোড়াইয়া
(প্রধান শিক্ষক, সেন্ট জেভিয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ভাটারা, বসুন্ধরা)

বই পড়ার বিষয়টি হল প্রথমত, আগ্রহ ও ধৈর্য। আরেকটি হল, জ্ঞান অর্জন করতে যে সাধনার দরকার; সে সাধনার পথ হল বই পড়া। বই পড়ার বিষয়টি ব্যক্তির নিজের ভিতর থেকে আসতে হয়। জোর করে কাউকে বই পড়ানো যায় না। সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে পড়তে হবে। অনুভূতি দিয়ে পড়তে পারলে আমরা জ্ঞানের আলো ছড়াতে পারব। সমাজে আমরা এখন কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছি। অতিরিক্ত প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ফলে বই পড়া থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছি। বই পড়ার জন্যে আমাদের সময় প্রয়োজন। আর সময়ের সঠিক ব্যবহার নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা চর্চা করা এবং বাস্তবতার আলোকে পথ চলতে হবে।

ছাপার অক্ষরে পড়ার গুরুত্ব রয়েছে
ডেভিড স্বপন রোজারিও (বিশিষ্ট লেখক, আমেরিকা)

এবারের বই মেলার সফলতা নিয়ে আমি দারুণভাবে আশাবাদী। কারণ এবারের বইমেলা একটু ব্যতিক্রমধর্মী, বিশাল জায়গা জুড়ে, অনেক নিরাপত্তার মাঝে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পথযাত্রায় প্রিয় প্রতিবেশী স্টল এ স্রোতধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সে জন্য আমি গর্বিত। আমি ভুল ধরার চেয়ে সহযোগীতায় বিশ্বাসী। তবে একটা পরামর্শ হলো, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের বই স্টল সম্বন্ধে আরও ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন। শুধু একবার একুশে বইমেলা নয়, পাঠক ও লেখকদের আরও উৎসাহিত করতে বছরে অন্তত আরও একবার আমাদের খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলে একটি বইমেলা করা যেতে পারে। এছাড়াও লেখকদের পরিচয় করিয়ে দিলে অনেকে অনুপ্রাণিত হবে। খ্রিস্টান সমাজকে বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাড়িতে একটি করে মিনি লাইব্রেরি গঠন করার পরামর্শ দিতে হবে। পাঠকদের বুঝাতে হবে বইই হচ্ছে দেহ ও মনের হাসপাতাল। প্রতিদিন কিছু কিছু লেখা ও পড়ার ঠিক অভ্যাস করতে পারলে জাগতিক অনেক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এটা একটা আন্দোলন হিসেবে সভা সমিতির মাধ্যমে পাঠকদের উৎসাহিত করতে হবে। বইই যেন হয় সকল

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

National Council of YMCAs of Bangladesh

1/1 Pioneer Road, Kakrail, Ramna, Dhaka – 1000

RECRUITMENT ANNOUNCEMENT

Background

National Council of YMCAs of Bangladesh in brief NCYB is the collective body of Local YMCAs located at the different parts of Bangladesh. NCYB was established in 1974 and registered under the Societies Registration Act - 1860 in 1974 as a Voluntary Organization. NCYB is an affiliated member of Asia and Pacific of Alliance of YMCAs and World Alliance of YMCAs. YMCA International House project is a 13th stored building (a project of NCYB) which located at B-2, Jalesware, PO: PATC, Savar, Dhaka-1343 owned by National Council of YMCAs of Bangladesh. The management of National Council of YMCAs of Bangladesh is planning to run a hotel (YMCA International House) at that building from level 5-14 at commercial basis. The profit of this project will be utilized for strengthening YMCA movement in Bangladesh. Therefore, we are looking for a passionate and energetic individual for following two positions;

General Manager (1)

Job responsibilities and required experiences: The applicant should have minimum 6 year(s) working experiences at any reputed hotel/guesthouse. He/She must have keen knowledge and practical experiences in the areas of customer care, front desk management, hotel management, operations and proven track record as a General Manager at any reputed hotel. He/She should have excellent interpersonal and communication skills with the ability to communicate effectively across all levels. Required academic qualification is bachelor degree in any discipline and diploma on effective hotel management. Both male and female can apply for this position within the age limit 45 years. The monthly salary package is negotiable.

Accountant (1)

Job responsibilities and required experiences: It is mandatory requirement the applicant is able to apply and maintain accounting software preferring Tally Accounting Software and should have minimum 5 year(s) working experiences at any reputed organization. Ensure that utility bills are paid on time and these documents are preserved properly. Ensure that the accounts are being maintained fulfilling regulatory compliance and accounting golden principles. Prepare and share the monthly financial report to the immediate supervisor as regular basis. Identifying the issues of financial risks of this project and share it immediately with the immediate supervisor and NGS. Ensure that finance department of this project keeps track of every financial transaction that occurs to ensure that all incoming and outgoing money is recorded and handled accurately. Discrepancies need to be investigated, share the reports with the concern authorities to correct and prevent financial risks. The candidate is able to collaborate effectively with other hotel employees to ensure teamwork. Both male and female can apply for this position within the age limit 40 years. The monthly salary package would be negotiable.

Front Desk Executive (2)

General Purpose: Welcome guests, check guests in and out of the hotel, deal with guest queries, provide prompt and professional guest service to meet guest needs and ensure guest satisfaction.

Duties and Responsibilities: Welcome and greet guests and answer and direct incoming calls. He or She will inform guests of hotel rates and services and make and confirm reservations for guests. Front Desk Executive will confirm relevant guest information, ensure proper room allocation, register and check guests in. He or She verify guest's payment method, verify and imprint credit cards for authorization, compute all guest billings, accurately post charges to guest rooms and house accounts. He or She will receive and transmit messages from guests, provide accurate information about local attractions and services, listen and respond to guest queries and requests both in-person and by phone. Front Desk Executive will inform housekeeping when rooms have been vacated and are ready for cleaning

Sales and Marketing Executive (1)

Duties and responsibilities: He or She will make lists of potential clients and conduct surveys to identify customers actively seeking a hotel. Will contact customers via calls or arranged meetings to discover their needs and requirements. Prepare and present sales proposal to potential clients, highlighting the best features and qualities of the hotel. He or She will provide customers with a list of available services and their accompanying prices and offer discounts when necessary. Oversee the booking and reservation of space at the hotel to ensure availability and proper arrangement. Collaborate with other hotel staff to ensure clients have a good time. Maintain contact with clients to obtain feedback and to discuss opportunities for future business deals. Set annual budgets and implement strategies effective for achieving set targets. Conduct assessment of sales performance to make necessary adjustments to increase patronage.

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হোটেল পরিসেবাদাতা (Housekeeper) - ৩ জন

দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ হোটেল পরিসেবাদাতা কর্মীগণ ওয়াইএমসিএ ইন্টান্যাশনাল হাউজ প্রকল্পটির অধীনে দায়িত্ব পালন করবেন। হোটেল পরিসেবাদাতা হোটেল রুম, রিসিপশন রুম, কনফারেন্স হল ও বেনকুইট হল-এর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্বসমূহ **বিশদভাবেঃ** অতিথিগণ হোটেল রুম ত্যাগ করার পর সকল হোটেল রুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তিনি নিশ্চিত করবেন যে, পরিস্কার কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস হোটেল রুমে নিয়ে আসা হয়েছে। হোটেল পরিসেবাদাতাগণ ময়লা কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, সাবান, টিস্যু পেপার, পানি এবং পানি পান করার গ্লাস, বাথরুম জীবাণুমুক্ত করে পরিস্কার করবেন, আসবাবপত্রসমূহ ধূলামুক্ত ও মোছা, সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করা, কার্পেট ছাড়া সকল মেঝে পরিস্কার করবেন। অতিথিগণ হোটেল রুম ত্যাগ করার পর হোটেল পরিসেবাদাতা নিশ্চিত করবেন রুম যেন নতুন অতিথির জন্য প্রস্তুত থাকে। হোটেল পরিসেবাদাতা কর্মীগণ যদি রুমের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ত্রুটি লক্ষ্য করেন তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তারা হোটেল রুমের কোন সামগ্রী নষ্ট ও হারিয়ে গেলে তাও কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। কোন অতিথি কোন সামগ্রী ফেলে গেলে তাও কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই কোন নামী হোটেলে কমপক্ষে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ইলেক্ট্রিশিয়ান (১)

দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ ইলেক্ট্রিশিয়ান পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীকে ওয়াইএমসিএ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ভবনটির সকল হাউজ ওয়েরিং-এর কাজ তত্ত্বাবধান করতে হবে। ভবনটিতে ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার স্টেশন রয়েছে তা নিয়মিতভাবে তত্ত্বাবধান করা, পাওয়ার স্টেশন সার্ভিসিং-এর উদ্যোগ নেয়া ও মেরামতের প্রয়োজন হলে তা করা। তিনি নিশ্চিত করবেন যে, ভবনটির বিদ্যমান লাইট, ফ্যান ও এয়ার কণ্ডিশনের লাইনগুলো সচল ও সক্রিয় রয়েছে। যদি কোন কারণে ইলেক্ট্রিক্যাল লাইনের ত্রুটি হয় তা তাৎক্ষণিক মেরামত করা। বিদ্যমান লাইট ও ফ্যান নিষ্ক্রিয় হলে সেখানে লাইট ও ফ্যান প্রতিস্থাপন করা। কনফারেন্স হল ও বেনকুইট হলের বৈদ্যুতিক লাইট ও এয়ার কন্ডিশন-এ কোন ধরনের ত্রুটি হলে তাৎক্ষণিক মেরামত করে সচল রাখা।

Application procedures

Interested candidates may apply along with complete CV, two copies of passport size recent photographs, attested copies of all educational and experience certificates and attested copy of National Identity Card should reach to the **"National General Secretary**, **B-2, Jalesware, PO: PATC, Savar, Dhaka1343 or e-mail box: bangladeshymca@gmail.com** on or before **February 28, 2020 during office hour**. Only the short listed candidates will be called for interview.

বিপ্র/৫৫/২০

প্রাণের মেলা ... (২০ পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানের সেরা উপহার। কারণ বই পড়ার বিকল্প নেই। আধুনিক মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হলেও ছাপার অক্ষরে কিছু পড়ার গুরুত্ব অতীতেও যেমন ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বই পাঠককে আনন্দ দেয়
খোকন কোড়ায়া (বিশিষ্ট গল্পকার)

এবারের বইমেলা আরো বিস্তৃত জায়গা নিয়ে অনেক বড় পরিসরে করা হয়েছে। যার ফলে আয়েসী ভঙ্গিতে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্টলে গিয়ে সময় নিয়ে বই বাছাই করে কেনার সুযোগ পাচ্ছে। এর জন্য কতৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাতেই হয়, ধন্যবাদ দিতেই হয়। আমাদের দেশে বইয়ের পাঠক দিন-দিন কমে যাচ্ছে আর আমাদের খ্রিস্টান সমাজে সেটা প্রকট আকার ধারণ করেছে। পাঠ্য বই আর পেশা সম্পর্কিত বই ছাড়া সাহিত্যের বই এখন খুব কম মানুষই পড়ে। অথচ একসময় আমরা বইয়ের পোকা ছিলাম। আশির দশকে দেখেছি লঞ্চে, বাসে ফেরিওয়ালারা বই বিক্রি করতো। নজরুল, নীহাররঞ্জন, ফাল্গুনী, শরৎচন্দ্র, শংকর, বিমল মিত্র, নিমাই ভট্টাচার্য, রোমেনা আফাজ, আনোয়ার হোসেনসহ আরো অনেক লেখকের বই হটকেকের মত বিক্রি হত তখন। আমাদের সমাজের অনেক লেখকের বই বেরিয়েছে। একুশের বই মেলায়ও অনেক খ্রিস্টান লেখক-কবির বই আছে। আমার জানামতে এ বছরই বেরিয়েছে বেশ কয়েকজনের বই। যেমন- রঞ্জনা বিশ্বাস, ডেভিড স্বপন রোজারিও, ড. অগাষ্টিন ক্রুজ, সিস্টার মেরী প্রশান্ত, ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ, সুপর্ণা এলিস গমেজ, দিলীপ এ্যালভীন বাগচি। এছাড়া আরো অনেক লেখক আছেন যাদের কথা আমি জানি না। আমরা যারা বইমেলায় যাবার সুযোগ পাই না, তারা প্রতিবেশীর প্রকাশনী থেকে বই সংগ্রহ করতে পারি। বই পাঠককে আনন্দ দেয়, আবার দুঃখ ভোলার শক্তিও যোগায়। বইয়ের মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর। আমার বিশ্বাস যে মানুষটা বই পড়ে সে কখনো বড় ধরণের কোন অন্যায় করতে পারে না। যে বই পড়ে সে নিজেকে চিনতে পারে, পৃথিবীকেও চিনতে পারে। আমাদের বই পড়তে হবে নিজেকে বদলাবার জন্য এবং প্রতিবেশকে বদলাবার জন্য।

উপসংহার : মানুষের আলোকিত জীবনের উপকরণ হচ্ছে বই। জগতে শিক্ষার আলো, নীতি-আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই জ্ঞানের প্রতীক বইয়ের মধ্যে নিহিত। মানব জীবন নিতান্তই একঘেয়েমি দুঃখ-কষ্টে ভরা, কিন্তু মানুষ বই পড়তে বসলেই সেসব ভুলে যায়। এ সবই উঠে এসেছে এবারের বই পড়ার ভাবনায়। আরো প্রকাশ পেয়েছে, পৃথিবীতে বিনোদনের কত কিছুই না আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু বই পড়ার নির্মল আনন্দের কাছে সেগুলো সমতুল্য হতে পারেনি। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক কোনো মজাদার বইয়ের বিষয়বস্তু বা ঘটনা মানুষ সহজে ভুলে যায় না। তাই জীবনের অবসর সময়গুলো বইয়ের নেশায় ডুবে থাকা দরকার॥ ❑

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

জে.আর. এ্যাগ্নেস পুরো নাম জপমালা রিবেরু এ্যাগ্নেস। স্বর্গীয় ভিনসেন্ট রিবেরু ও স্বর্গীয় আন্না গমেজের মেয়ে। পিতা মাতা মৃত্যুর পর তিনি বটমলী হোম অর্ফানেজ ছিলেন। সেখান থেকে এসএসসি, হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি এবং লালমাটিয়া কলেজ বিএ এবং তিতুমীর কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। তিনি অনেক বছর যাবৎ এই সংক্ষিপ্ত নামে অনলাইনে লিখছেন। বর্তমানে ঢাকা উত্তরাতে থাকেন।

তার লেখা ছোট গল্প **"নির্জন দুপুরে একাকী"** এবং কবিতার বই "অব্যক্ত ভালোবাসা" এবারের বইমেলায় জিনিয়াস প্রকাশনী ৮ং প্যাভিলিয়ন থেকে পাওয়া যাবে। তার লেখা উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষায়।

যোগাযোগের জন্য :
মোবাইল : ০১৭১৪-৩৮-১৩৪৭, ইমেইল reberio25@gmail.com

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ক্যামেরুনকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলাপের আহ্বান জানিয়েছে কাথলিক বিশপগণ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬জন কাথলিক বিশপ ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়াকে আহ্বান করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলাপে বসতে। দেশের উত্তর-পূর্বের নিতুম্ব গ্রামে একটি আক্রমণ হলে বিশপগণ এ আহ্বান রাখেন। তারা বলেন, তাদের এ আহ্বান কোন রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়। তারা নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের দুর্দশা দেখে এবং স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ক্যামেরুন প্রত্যাশা করে এ প্রস্তাব করেছেন। ইতোমধ্যে ২০০০ জন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে মারা গিয়েছে। বিশপগণ চিঠিতে বলেন, 'এদের প্রত্যেকের জীবনই অমূল্য এবং তাদের কষ্ট যন্ত্রণায় আমরা শোকাহত। তাই আমরা চাই নিষ্পাপ জীবনের যেন কোন ক্ষতি না হয়। দলগুলো পারস্পারিকভাবে নিজেদের ও অন্যদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলোর প্রতি যদি সমান মর্যাদা দিতে পারে, তাহলে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

বিশপদের পরবর্তী বিশ্বধর্মসভা ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মূলভাবের বিষয়ে পোপ মহোদয় সিদ্ধান্ত নিবেন

বিশপদের সিনডের সেক্রেটারিয়েটের এক সভায় পোপ ফ্রান্সিস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশপদের পরবর্তী বিশ্বধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে। যাতে করে এতে অনেকের অংশগ্রহণ থাকতে পারে। সিনডের বিষয়বস্তু এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে পোপ মহোদয়ের কাছে তিনটি বিষয় দেওয়া হয়েছে। পোপ মহোদয় সেখান থেকে মূল বিষয় বেছে নিবেন।

দৈনন্দিন জীবনে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে ইণ্ডিয়ার কাথলিক চার্চের আহ্বান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্গালুরে বার্ষিক প্লেনারি সভায় দেশের লাতিন-রীতির সকল বিশপগণ মিলিত হন। এ সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে আর্চবিশপ যামবাতসিস্তা দিকোয়াত্রো, এপস্টলিক নুনসিও, ইণ্ডিয়া ও নেপাল বলেন, খ্রিস্ট অনুসারীদের মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধ: দয়া ও মমতা প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব রয়েছে। মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধে দৃঢ় হতে আমাদের দেশের বিশপগণ খ্রিস্টভক্তদের উৎসাহিত করবেন। প্লেনারি সভায় উদ্বোধনীতে আর্চবিশপ যামবাতসিস্তা দিকোয়াত্রো সভাপতিত্ব করেন। ১৩-১৯ ফেব্রুয়ারি এই বার্ষিক প্লেনারি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিসিবিআই প্রেসিডেন্ট, গোয়া ও দামানের আর্চবিশপ ফিলিপে নেরী, বার্ষিক প্লেনারি সভায় সভাপতিত্ব করেন। মণ্ডলী ও মণ্ডলীর জনগণ কঠিনতা মোকাবেলা করা সত্ত্বেও জাতি গঠনে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বৈষম্যহীন এক সমাজ করার আহ্বান রাখেন। অন্যদিকে সিবিসিআই এর প্রেসিডেন্ট, কার্ডিনাল ওসওয়াল্ড গ্রাসয়িাস সকল বিশপকে অনুরোধ করেন যেন তারা জীবনের সংস্কৃতি ও জাতি গঠনে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করেন। ২৪ সপ্তাহ গর্ভকালীন সময়সীমাতে গর্ভপাতের যে অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কাথলিক মণ্ডলী ও পোপের শিক্ষা পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, গর্ভধারণের সময় থেকেই মানব জীবনকে সর্বোত্তমভাবে রক্ষা ও সম্মান জানাতে হবে। গর্ভধারণ থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত মণ্ডলী মানব জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে অবিচল রয়েছে। মানব জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে খ্রিস্টের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে বিশপদের বিশেষ দায়িত্বও রয়েছে বলে কার্ডিনাল মনে করেন। সিসিবিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইণ্ডিয়া থেকে ২৬জন বিশপ এফএবিসি'র (এশিয়ান কাথলিক বিশপস্ কনফারেন্স) সুবর্ণ জয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করবে।

'হলি সি'র ভবিষ্যৎ কূটনীতিকরা বিশেষ প্রেরণকাজে এক বছর ব্যয় করবে

- পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিস 'হলি সি'র কূটনীতিকদের কারিকুলামে '১ বছরের প্রেরণকাজের অভিজ্ঞতা' বিষয়টি যুক্ত করেছেন। আমাজান সিনডের চূড়ান্ত বক্তব্যে পোপ মহোদয় এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। 'হলি সি'র কূটনীতিকদের শিক্ষাকেন্দ্র পন্টিফিক্যাল এক্লেসিয়াল একাডেমীর বর্তমান প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ যোসেফ মারিনোকে এক চিঠির মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস কূটনীতিকদের কারিকুলামে '১ বছরের প্রেরণকাজের অভিজ্ঞতা বিষয়টিকে অর্ন্তভূক্ত করার অনুরোধ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি এ চিঠি দেন। এ এক বছর স্থানীয় মণ্ডলীতে ভবিষ্যত কূটনীতিকরা অভিজ্ঞতা করবেন। পুণ্যপিতা তার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, যেসকল যাজকেরা ভবিষ্যতে ভাতিকানের কূটনৈতিক সার্ভিসে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার বাসনা রাখে তারা একটি ধর্মপ্রদেশে এক বছরের মিশনকাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি দৃঢ় আশাবাদী এই অভিজ্ঞতা 'হলি সি'র ভবিষ্যতের রাষ্ট্রদূত বা পোপের প্রতিনিধিদের জন্য খুব উপকারী হবে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পন্টিফিক্যাল এক্লেসিয়াল একাডেমীতে পোপ মহোদয় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে প্রেরণকাজে আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে, তাই আপনাকে একদিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাবে। কেননা ইউরোপের একটি জাগরণের প্রয়োজন; আফ্রিকা পুনর্মিলনের জন্য তৃষ্ণার্ত; লাতিন আমেরিকা পুষ্টি ও নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্ষুধার্ত; কাউকে বাদ না নিয়ে নিজেদের শিকড় আবিস্কার করতে চাচ্ছে উত্তর আমেরিকা; আর এশিয়া ও ওশেনিয়া পুর্বপুরুষদের সংস্কৃতির বিশালতার সাথে সংলাপ ও অভিবাসীদের সক্ষমতা দ্বারা চ্যালেঞ্জিত। এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে 'হলি সি'র ভবিষ্যত কূটনীতিকগণ ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলবে। আর তাই যাজকীয় ও পালকীয় গঠনের সাথে তারা তাদেও নিজেদের ধর্মপ্রদেশের বাইরে অন্যকোন স্থানে এক বছরের মিশনকাজের অভিজ্ঞতা করবে; তাদের যাত্রাপথে মিশনারী মণ্ডলীর সাথে সহভাগিতা করবে এবং প্রতিদিনকার মঙ্গলবাণী প্রচারে অংশগ্রহণ করবে। এই ধারণার আলোকে পুণ্যপিতা আর্চবিশপ মারিনোকে বলেন যেন তার ইচ্ছাটা কার্যে পরিণত করা হয়। ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকেই তা কার্যকরী হতে যাচ্ছে। পোপের এই নির্দেশনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর্চবিশপ মারিনো বলেন, মিশনারী অভিজ্ঞতা পরিবর্তনের এমন একটি ধারা যা আমাদেরকে নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে এবং বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের বাস্তবতার প্রতি উন্মুক্ত হতে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য আর্চবিশপ যোসেফ মারিনো একসময় বাংলাদেশে পোপের প্রতিনিধি হিসেবে সেবা দিয়ে গেছেন।

- তথ্যসূত্র : news.va

পবিত্র ক্রুশ সংঘে'র ব্রাদারদের প্রতিষ্ঠার ২০০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

ব্রাদার অর্পণ গ্লেইস পিউরিফিকেশন ▮ গত ৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী, কসবা, দিনাজপুরে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো তৎকালীন সাধু যোসেফে'র ব্রাদারদের (বর্তমানে হলি ক্রস ব্রাদারস্) প্রতিষ্ঠার ২০০ বর্ষপূর্তি উৎসব। এই জুবিলী উৎসবের প্রধান অংশ ছিল ব্রাদারদের জীবন ও প্রৈরিতিক সেবা বিষয়ক সহভাগিতা ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ। ব্রাদারদের জীবন ও প্রৈরিতিক সেবা সম্বন্ধে সহভাগিতা করেন পবিত্র ক্রুশ সংঘ পরিচালকের তয় উপদেষ্টা ব্রাদার রিপন জেমস্ গমেজ সিএসসি। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি এসটিডি। বিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে বলেন, 'জুবিলী হল ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন। যে মহৎ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ব্রাদারদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা যেন তারা নবায়ণ করে এবং মণ্ডলীতে তাদের সেবাকাজ অব্যাহত রাখেন।' এই মহতী উৎসবে ৯জন হলি ক্রস ব্রাদার, ৯জন যাজক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক সিস্টার, প্রায় চারশত খ্রিস্টভক্ত ও কিছু সংখ্যক অন্য ধর্মালম্বী ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পর ব্রাদারদের বিশেষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়॥

শ্রীমঙ্গলে প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব পালন

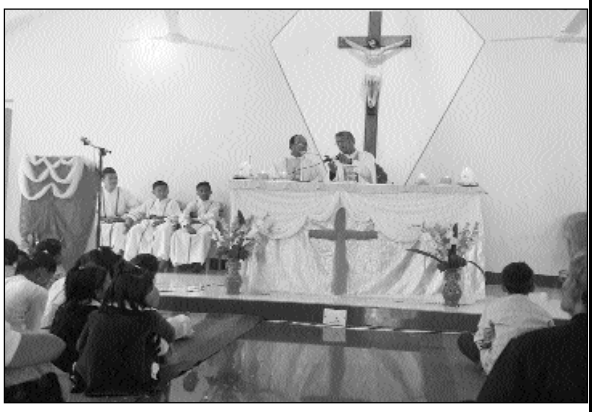

রনি সরকার ▮ গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর আলিয়াছড়া খাসিয়া পুঞ্জির গির্জাঘরের প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব পালিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি, সহায়তা করেন সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার নিকোলাস পাদুয়ার সাধু আন্তনীর জীবনী তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধু আন্তনী মুখ দিয়ে যা বলতেন তাই হতো, এজন্য সাধু আন্তনীর জিহ্বা এখনও নষ্ট হয়নি। বিশ্বের অনেক দেশে সাধু আন্তনীর জিহ্বা নিয়ে যাওয়া হয়, বাংলাদেশেও এসেছিল। এখনও অনেকে সাধু আন্তনীর নিকট হারানো জিনিস ফেরত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে, তা ফেরত পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর বিভিন্ন খাসিয়া পুঞ্জি ও বাগান হতে প্রায় ৩০০ খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির পক্ষে টমাস পড়ুয়েং ॥

মোহাম্মদপুরে নিবেদিত জীবন দিবস উদ্‌যাপন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি ▮ গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার বিকালে, বিসিআর (বাংলাদেশ কনফারেন্স অফ রিলিজিয়াস)-এর উদ্যোগে মোহাম্মদপুর সাধ্বী খ্রীষ্টিনার গির্জায় "যুবক, আমি তোমাকে বলছি ওঠ!" এই মূলসুরকে সামনে রেখে ঢাকা শহরে সেবাদানরত বিভিন্ন সন্ন্যাস-সংঘের সদস্য ও সদস্যা এবং গঠনপ্রার্থীগণ নিবেদিত জীবন দিবস উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ক্ষুদ্র প্রার্থনা শেষে শুভেচ্ছা ও উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিসিআর এর প্রেসিডেন্ট ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি। এরপর মূলসুরের উপর সহভাগিতায় ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা বলেন, আমাদের নিবেদিত জীবনটা হল ঈশ্বরের ভালবাসার প্রকাশ। আমরা এই জগতে নিবেদিত ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে। সন্ধ্যায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই মোমবাতি হাতে সম্মিলিত আলোক শোভাযাত্রা করা হয়। খ্রিস্টযাগে মঙ্গলসমাচার পাঠ শেষে বিভিন্ন সংঘের প্রতিনিধিগণ নিজেদের সংঘের সংবিধান শোভাযাত্রা

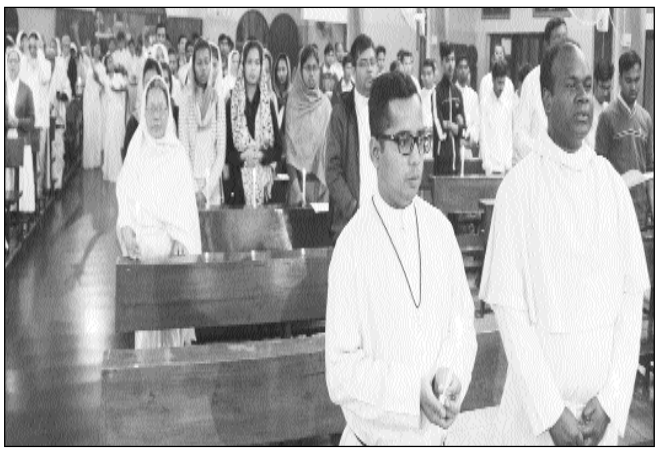

করে এনে বেদীর সামনে রাখেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার বলেন, প্রভু যিশু খ্রিস্ট জীবন, আলো ও ভালবাসা হয়ে এই জগতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রান্তিক, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। আজ প্রভু যিশুর এই প্রেরণকর্ম আমাদেরই প্রেরণকর্ম। পরিশেষে বিসিআর এর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স সিএসসি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্রতধারী-ব্রতধারিনীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০জন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

কামনা কস্তা ▮ 'যিশুর দীক্ষায় শিশুর শিক্ষা' এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ২ ফেব্রুয়ারি ফৈলজানা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লীতে শিশু ও শিশু এনিমেটরদের অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয় পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক কর্মসূচীতে ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ শুরুর আগে শিশুরা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করে এবং বেদীতলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি এবং সহযোগিতা করেন সহকারী পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি। খ্রিস্টযাগের উপদেশ বানীতে ফাদার এ্যাপোলো বলেন, "যিশুর দীক্ষায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবক, শিক্ষক ও গুরজন যারা রয়েছি তাদের সবার। আমরা যেন আমাদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে যিশুর শিক্ষায় শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে গঠনদানে সাহায্য করি।" খ্রিস্টযাগের পরপরই শিশুরা মিশন প্রাঙ্গণে এক আনন্দ র‍্যালি করে। দিনব্যাপী আয়োজনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে ছিল বাইবেলভিত্তিক অভিনয়, বাইবেল কুইজ, ধর্মীয় গান ও প্রার্থনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার বিকাশ। শিশুমঙ্গল দিবসে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ফাদার বিকাশ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে উক্ত দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

খনজনপুরে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের নবনির্মিত গির্জার উদ্বোধন ও ডন বস্কোর পর্ব উদ্‌যাপন

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি ▮ গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, খনজনপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের উপধর্মপল্লী নিত্তিপাড়ার নবনির্মিত গির্জার শুভ উদ্বোধন এবং ডন বস্কো খ্রিস্টাব্দেসিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু জন বস্কোর পর্ব পালন করা হয়। শুরুতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার পল গমেজকে কীর্তন করে ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অতঃপর খনজনপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পাওয়েল কোচিয়েক এসডিবি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যের পর ফাদার গমেজ উদ্বোধন করে পবিত্র জল সিঞ্চন করেন। অতঃপর খ্রিস্টযাগে শুরু করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার গমেজ বলেন, "আমাদের হৃদয় মন্দির গেঁথে তুলতে হবে দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিদিনকার জীবনে চর্চা ও জীবনসাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে চিরকাল টিকিয়ে রাখতে হবে।" খ্রিস্টযাগ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর খনজনপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পাওয়েল সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আজকের এই গির্জাটি নতুন আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে নতুন করতে পারি।" পরিশেষে, প্রীতিভোজে সকলেন অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ-এর স্মরণসভা

লতিকা এম কস্তা ▮ গত ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ'র স্মরণে কারিতাস সিএইচ-এনএফপি স্টাফগণ স্মরণসভার আয়োজন করেন। কারিতাস সিএইচএফপি প্রকল্পের

প্রতিষ্ঠাতা সিস্টার মেরী ইমেল্ডা তার জীবনের অধিকাংশ সময় প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সিএইচএনএফপি'র মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রতিটি ধর্মপ্রদেশীয় কাথলিক-অকাথলিক সকল দম্পতিদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সেমিনারী ও গঠনগৃহে এবং যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিগত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্রতধারিনী ও নার্স হিসেবে তার এ মহান সেবা ও নিবেদিত জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা হয়। উক্ত স্মরণসভায় সিস্টার মেরী ইমেল্ডাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে প্রার্থনায় স্মরণ এবং তার আত্মার চির-শান্তি কামনা করা হয়॥

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ এর

৪টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, একাডেমীর আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ এর ৪টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মো: খলিলুর রহমানের ঘোষণায় মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতি সত্তার কবি, ফেলো, বাংলা একাডেমি, প্রেসিডেন্ট রাইটার্স ক্লাব ও সাবেক পরিচালক, বাংলা একাডেমি, মোহাম্মদ নুরুল হুদা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির জনসংযোগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক, মি: অপরেশ কুমার ব্যানার্জি, সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার সম্পাদক, সৈয়দ তোশারফ আলী ও অনুবাদক মি: এম, মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নটরডেম বিশ্ববিদালয় বাংলাদেশ এর ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক, রেভা: ফাদার ফ্রাঙ্ক কুইনলিভান, সিএসসি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মি: গাব্রিয়েল রোজারিও।

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ড. আগস্টিন ক্রুজ বলেন - প্রকৃতিই আমার গুরু। সৃষ্টির বিস্ময় রস আমার মানস-জগতের খাদ্য। সৃষ্টির রহস্যঘেরা তত্ত্বকথা বিপাকে বিভ্রাটে অসমাপ্তে সমাপণে আঁধারে আলোর রেখা খোঁজার স্পৃহা সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় আমার মধ্যে, যার ফসল আমার বিজ্ঞানচর্চা, দর্শন গবেষণায় আমার পদার্পণ। আমার ধীর-শান্ত মানস-জগতে হাজারো প্রশ্নের জন্ম দেয় নিরবে, নিভৃতে, একাকিত্বে। কখনো বিচ্ছিন্ন এলোমেলো ধারণা ভর করে কলম ধরে ধ্যানে মগ্ন থাকার বাসনায় এলোমেলো ধারণাকে গুছিয়ে একদেহ করার প্রয়াসে দেখি একটা কবিতা হয়ে গেছে। আমার একটা কাব্যগ্রন্থের নাম "আমার জন্ম হয়েছে বলেই" এই চারটি শব্দেই যেন গভীর অনুভূতির অঙ্কুরোদম ঘটে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাবের জন্ম হয়। বই পড়া ও লেখা আমার আত্মিক খাদ্য। মানুষের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান।

এছাড়া তিনি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনায় জ্ঞানকোষ প্রকাশনা, মি: গাব্রিয়েল রোজারিও, ড. ইসিদোর গমেজ, মি: উইলিয়াম কুলুম্ভনু, নজরুল একাডেমীর মিন্টু ভাই, বাবু রহমান, এম মিজানুর রহমান, শান্তিরাণী সিস্টারসহ যাঁরা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি মো: নুরুল হুদা বলেন - ড. আগস্টিন ক্রুজ স্বাভাবিকভাবেই কবিতা লেখেন। তাঁর লেখা সত্ত্বার নতুন আবির্ভাব। মানব জন্মের সত্ত্বার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সত্ত্বা দিয়ে আরেক সত্ত্বায় যাওয়া বিবর্তনবাদ। যুক্তির মাধ্যমে মুক্তি আসবেনা, বিশ্বাসে আসবে। মিমাংসা তৈরী করতে হবে, অনেকে করেন না। এই প্রশ্ন করার প্রবণতা তাঁকে কবি করেছে। একটা সংলাপ হয়, যা সে নিজের মধ্যে করে থাকে।

তিনি আরো বলেন - আমার বন্ধু আগস্টিন ক্রুজ। তিনি ব্যক্তি সত্ত্বার স্থানে মানুষ। মানুষ আবার নিজস্বতায় ভিন্ন। যা কিছু পুণ্য তা-ই জ্ঞান। উগ্রবাদীরা গলা কাটে তাতে জ্ঞানের চর্চা হয় না।

সৈয়দ তোশারফ আলী বলেন - ড. আগস্টিন ক্রুজ হৃদয়ের ভাষা দিয়ে কবিতা সৃষ্টি করেছেন। কবিতা পাঠকের সাথে কথা বলার যোগাযোগ মাধ্যম। কবি হিসেবে ধর্মকে চরমভাবে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে কবিতায় তুলে ধরেছেন। রক্ত মাংসের মানুষ, পিছুটানে বিভ্রান্ত হয় সবসময়। তাঁর কবিতা অসীম সত্ত্বার সাথে মিশে যাবার পথ প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তিনি যিশু খ্রিস্টের পথকে পরিচিত করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় আছে কবিতায়। বিজ্ঞান নতুনভাবে এগিয়েছে। তাঁর কবিতায় আছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আধুনিক মননের চিন্তা।

অপরেশ কুমার ব্যানার্জি বলেন - নিজের মধ্যে নিজেকে খোঁজা। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্য ধারাবাহিকতায়। তাঁর কবিতা স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক। স্রষ্টা যেখানে থাকেন তিনি স্রষ্টাকে খুঁজেন।

অনুবাদক মি: এম মিজানুর রহমান বলেন, ড. আগস্টিন ক্রুজের কবিতাগুলো বিশ্ববহ্মান্ড নিয়ে, তার গতিময়তা, সৌন্দর্য পিপাসা নিয়ে। তাঁর কবিতায় মানবিক সম্পর্ক বেশী প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার ভাব বিশ্বব্রহ্মান্ড ও সৃষ্টিকর্তা। তার কবিতা যারা পড়বেন, তারা বুঝতে পারবেন।

সভাপতির ভাষণে ফাদার ফ্রাঙ্ক কুইনলিভান সিএসসি বলেন - মানুষের ৫টি ইন্দ্রীয় আছে, উপলব্ধি করতে। আমরা কথা বলি, শুনি, স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, স্বাদ নেই ও উপলব্দি করতে পারি। দেহ আছে, মন আছে, হাত আছে, একজন ভাল কবি সব স্পর্শ করতে পারেন। তাঁর এই কাজ উপহারস্বরূপ, সকলের জন্য, তিনি যেন সকলের নবদৃষ্টি লাভ করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মি: গাব্রিয়েল রোজারিও বলেন - এই নিয়ে তৃতীয়বার কবিতার বই প্রকাশিত হল। এটা তাঁর প্রতিভার বিকাশ। তিনি বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ, প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অনেকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এ পর্যন্ত ড. আগস্টিন ক্রুজের ১৫ টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তৎমধ্যে ১২টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজী।

অনুষ্ঠানে কবি ড. আগস্টিন ক্রুজের সদ্য প্রকাশিত বই থেকে কবিতা আবৃত্তি করা হয়। আবৃত্তিতে অংশ নেন যথাক্রমে রোকসানা ইনাম, স্মৃতিকা সরকার স্মৃতি, সুবীর লরেন্স গমেজ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রকৃতি ইসলাম॥ ❑

কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই . . . ।

প্রয়াত আন্তনী পিউরীফিকেশন

জন্ম : ২ মে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
দাড়কাভাঙ্গা, নাগরী ধর্মপল্লী

স্মৃতিরা আজও বাস্তবে ঘুরে ফেরে। দিন মাস এমনি করে একটি বছর হয়ে গেলো আজ তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার কাছে। প্রতিদিনের সকালে নাস্তার টেবিলে, টিভি সেটের সামনে, প্রার্থনা সভায়, বিকালে উঠান প্রাঙ্গণে এখন আর তুমি বসো না। দোকানের সামনের বেঞ্চটিতে এখন আর কেউ বসে খবরের পাতা উল্টায় না। আজ সবকিছুই স্মৃতির পাতায়। তোমার ভালবাসা, তোমার আদর-সোহাগ, তোমার আশীর্বাদকে পাথেয় করে চলে যাচ্ছে জীবন জীবনের নিয়মে। ভীষণ ভালবাসি তোমাকে, খুব মিস করি তোমাকে। তোমার অভাব কোন কিছুতেই পূরণ হবার নয়। ভালো থেকো ওপারে।

স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। অনন্তকালে তোমার সাথে পিতার গৃহে আবার দেখা হবে।

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।"

তোমার আদরের,
স্ত্রী : কনক মেরী পিউরীফিকেশন
ছেলে ও বৌ : বিপ্লব ও হীরা
মেয়ে ও জামাই : সিতারা-জর্জ, আইভী-সেবাস্টিয়ান, লিপি-প্রদীপ
নাতী ও নাতী বৌ : জুয়েল-সিন্ডা, রনি-বন্যা, টেরেন্স, প্রত্যয়, প্রমিত, এড্রিয়ান
নাতনী ও জামাই : জুই, জুলি-পার্থ, সাথী, শ্যারন
পুতি ও পুতিন : ঐন্দ্রিলা, অনান্দিতা, ইথান ও মায়া।

বিজ্ঞ/৫১/২০

১৬তম মৃত্যু বার্ষিকী

**"সদা হেসে বলতে কথা দিতে না প্রাণে ব্যথা
মরণের পরে হলে বেদনার স্মৃতি গাঁথা"**

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার কথা, হাসিমাখা মুখ, সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সব কিছু আমরা এখনও অনুভব করি। তোমার জীবন শিক্ষাই আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন মাঝে।

বিশ্বাস করি, স্বর্গীয় পিতার পাশে তুমি আছ। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও তোমার জীবনাদর্শে অতিবাহিত করতে পারি আমাদের অনাগত দিনগুলি।

স্ত্রী : সরোজনী দেশাই
মেয়ে ও মেয়ের স্বামী : মুক্তি-সুনির্মল এবং যুঁথি-পলাশ
ছেলে : হেমন্ত দেশাই
নাতি ও নাতনী : আবির, অর্ঘ্য, অপরাজিতা এবং আরোস।

প্রয়াত হরলাল সিপ্রিয়ান দেশাই

জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়ইহাজী, শুলপুর।

বিজ্ঞ/৫০/২০

BOOK POST

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" । (মার্ক - ১৬:১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা **আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ৬ মার্চ হতে ১২ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত আরএনডিএম ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ মোহম্মদপুরে "এসো দেখে যাও" কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি।** এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ আহ্বান আরও স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী এসএসসি ও তদূর্ধ্বে পড়াশুনারত সকল ছাত্রীদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ৬ মার্চ, ২০২০ (ঢাকা মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
প্রস্থান : ১২ মার্চ ২০২০
রেজিস্ট্রেশন ফি : ৫০০ টাকা মাত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা -

সিস্টার সুবর্ণা লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কলাসটিকাস কনভেন্ট
ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা আরএনডিএম (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ
গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

বিজ্ঞ/৫৮/২০

অনন্ত যাত্রা

"পৃথিবীতে সব কিছু শেষ হয়
বসন্ত গান মুকুলিত প্রাণ ক্ষণকাল রয়
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যথা ময়।"

প্রয়াত সামুয়েল সুরবেট গমেজ
জন্ম : ২৪ আগস্ট, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বক্সনগর (বইলা বাড়ি)

সময় ও নদীর স্রোত যেমন কোনদিন আপন ঠিকানায় ফিরে আসে না, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না জানি।

পাপা, তুমি আমাদের সবাইকে ছেড়ে **গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মহান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলে।** তোমার শূন্যতা আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছি। তোমার অভাব কি করে পূরণ হবে মায়ের কাছে ও তোমার সন্তানদের কাছে। তোমার আদর, ভালবাসা ও শাসনে আমাদের ভাই বোনকে মানুষ করেছো। আমাদের তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা ভাইবোনেরা মাকে নিয়ে একসাথে ভালভাবে থাকতে পারি। আমার পাপা ছিলেন পরোপকারি, মিশনের, সমাজের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। আমার পাপার অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে বিভিন্নভাবে যারা সাহায্য সহযোগিতা, বিশেষ করে অনেকেই প্রার্থনা করেছেন, আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাপা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার গৃহেই আছো। তোমার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করি।

তোমারই ভালোবাসার,
স্ত্রী : বৃজেট গমেজ
ছেলে ও ছেলের বৌ : তাপস ও চৈতী, রকি ও তপুতী
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রূপা ও রাজেন, তপুতী ও নির্মল
নাতি-নাতনী : প্রতীক, প্রিয়া, সোনালী, প্রতীম
হৈমন্তী, প্রত্যয়, গোধূলী, এনেস্কা

বিজ্ঞ/৫২/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org